চিঠি

৪র্থ খণ্ড

পুনর্জ্জন্ম

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত সঙ্কলিত

নিবেদন

'পুনর্জ্জন্ম' 'জন্মমৃত্যু'রই পরিশিষ্ট। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির সম্ভাবনায় স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হইল।

এবৎসর আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ব্রত-পার্ব্বণ ও পূজা প্রভৃতি নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সকল অতি উচ্চ সাধনসম্বন্ধীয় তত্ত্ব নিহিত আছে, উহাতে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

যাঁহারা মৃত্যুর প্রহেলিকা ভেদপূর্ব্বক বিগতশোক ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইতে উৎসুক, পৃথিবীর সেই চির-জিজ্ঞাসু সন্তানগণের উদ্দেশেই এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

বিনীত
শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৩৬
৩১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

পুনর্জন্ম

ওঁ

শাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ

পুনর্জন্মবাদ প্রায় সমস্ত সনাতন ধর্ম্মের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর বেদ-উপনিষদ স্মৃতি-পুরাণ তো পুনর্জন্ম-রহস্যে ভরপূর। হিন্দুসমাজ এই তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ-রূপে এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে, ইহার প্রমাণ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা বা শুনা ততটা প্রয়োজনীয় বলিয়া কখনও মনে হইত না। কর্ম্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদকে হিন্দুধর্ম্মের দুইটি অতি সুদৃঢ় প্রাচীন ভিত্তি বলিলেও চলে। পুনর্জন্মবাদ হিন্দুদিগের মজ্জাগত তত্ত্ব। হিন্দুদের সব অনুষ্ঠানে সব চিন্তায় ও ধ্যানে এই তত্ত্ব অনুস্যূত ও অনুপ্রবিষ্ট।

আজকাল কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন হিন্দুর প্রাচীনতম ঋগ্বেদে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ নাই, সুতরাং ইহা

বেদবিরুদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস ঋগ্বেদে পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে অসাধক পণ্ডিতগণ বেদাদি-গ্রন্থ যে ভাবে পড়িয়াছেন, যে ভাবে বুঝিয়াছেন, যে ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে বেদের অনেক তত্ত্ব অনেক গূঢ় রহস্য অনেক সাধন-কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে সব শ্রুতি লইয়া সাধক-ভক্ত আনন্দসমাধিতে বিভোর থাকেন, আধুনিক পণ্ডিতগণ যখন সেই সব শ্রুতি লইয়া প্রাচীন ঋষিদের অজ্ঞতা ঘোষণা করিতে প্রয়াসী হন, তখন আঙ্গুর যে কেন টক তাহা বুঝিতে আর সন্দেহ থাকে না। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মানুভূতির সার-তত্ত্ব যে সব শ্রুতি ঘোষণা করে, সেগুলি লইয়া যখন কেহ ঋষিদের অনুভূতিকে স্থূলে সীমাবদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের জ্ঞানের অপরিপক্কতা দেখাইতে বসেন, তখন এই ভাবের কথা মনে হওয়াই যে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। যাহা হউক আমাদের বিশ্বাস, বেদে সাধনসম্বন্ধীয় শ্রুতিগুলি আমরা ঠিকভাবে বুঝিতে পারি না।

ঋক্‌বেদ

ঋগ্বেদের ঋষিগণ সূর্য্যকে তাহার ত্রিবিধভাবেই উপাসনা করিতেন। সূর্য্যদেবের উদয় পরিণতি পূর্ণ বিকাশ, অপক্ষয় ও অস্ত এবং পরদিনের আবার উদয়-অস্ত লইয়া

তাঁহারা জন্মমৃত্যু ও পুনর্জন্মের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১০-৮৫-১৮)। ঋষিদের বর্ণনা হইতে বেশ সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, পুনর্জন্মতত্ত্ব তাঁহাদের নিকট সুপরিচিত ছিল। "দেবমাতা কশ্যপ-(পরব্রহ্ম)পত্নী অদিতি তাঁহার আটজন পুত্রের মধ্যে সাতজনকে দেবতাদের নিকট লইয়া গিয়া অমর করিয়াছিলেন ; অষ্টম পুত্র মার্ত্তণ্ড দেবতাদের নিকট অমরত্বলাভে বঞ্চিত হইয়া বার বার জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন" (১০-৭২-৮৯)। ইহা ছাড়া অন্যত্র দেখান হইয়াছে—যে আত্মা এখনও মাতৃগর্ভে লুক্কায়িত, সে কি ভাবে বহুবার জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যাতায়াত করে (১-১৬-৩২) ; এবং স্বর্গসুখ ভোগের পরে কি ভাবে পুনরায় মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করে এবং তাহার কামনা বাসনা সংস্কার কি ভাবে তাহার গতি নির্দ্ধারিত করে। অন্যত্র দেখিতে পাই, স্বর্গস্থ আত্মা স্বর্গসুখ ভোগান্তে যাহাতে সৎকুলে জন্মলাভ করিতে পারে সেজন্যও তাহার জীবিত আত্মীয়স্বজন প্রার্থনা করিয়া থাকেন। (১০-৫৯-৫,৭। ১০-৫৮-১২। ১০-৬০-১০। ১০-১৪-৮, ২৮)। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে এই পুনর্জন্মতত্ত্বের পূর্ণবিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শতপথ-ব্রাহ্মণে পুনর্জন্মতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া বাহির করা হইয়াছে।

বেদ সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত ; ইহার মধ্যে

সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে কর্ম্মকাণ্ড, এবং আরণ্যকে ও উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে যজ্ঞাদি ব্যাপারকে আমরা যে ঠিকভাবে বুঝিতে বুঝাইতে কতটা অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের জীবনগত কার্য্যকলাপ আমাদের বর্ত্তমান সময়ের অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদির কথা ভাবিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বেদের যে কাণ্ড যে উদ্দেশ্যে লিখিত সেই কাণ্ডে সেই বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানের আশা করাই স্বাভাবিক। উপনিষদ ও আরণ্যক তত্ত্বজ্ঞানের বিচার করিয়াছেন, সে অংশ জন্মান্তর-রহস্যে পরিপূর্ণ; সুতরাং ঋগ্বেদে জন্মান্তর-তত্ত্বের উল্লেখ নাই একথা পণ্ডিতের মুখে শোভা পায় না।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে পুনর্জন্ম-রহস্য 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' নামে সুপরিচিত। সে সময় এই বিদ্যা রাজর্ষি-মহর্ষিদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করা হইত। অরুণের পুত্র শ্বেতকেতুকে জীবলের পুত্র রাজা প্রবাহণ জীবের উৎক্রান্তি গতি ও জন্মান্তর সম্বন্ধে পাঁচটি প্রশ্ন করেন। শ্বেতকেতু উপযুক্ত উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া লজ্জিতভাবে আপন পিতার নিকট ফিরিয়া যান। অরুণও ইহার উপযুক্ত উত্তর জানিতেন না। তখন পিতাপুত্রে রাজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তদুত্তরে সেই গুহ্য পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা উপদেশ করিলেন।

উপনিষদ

জীব কিরূপে দেহান্তে পরলোকে গমন করে, কিরূপে স্বর্গে গিয়া কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগান্তে পিতৃদেহে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দশমাস গর্ভে শয়ান থাকিয়া জন্মলাভ করে, পরে আবার আয়ুঃক্ষয়ে পুণ্যাত্মা কিরূপে দেবযান-পথে উত্তরায়ণ-মার্গে এবং অপরে পিতৃযান-পথে দক্ষিণায়নমার্গে উৎক্রান্ত হইয়া আপন আপন কর্ম্মানুসারে উত্তম ও অধম গতি লাভ করে, ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা তাহার সুন্দর বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়েও আমরা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ দেখিতে পাই। সেখানেও রাজর্ষি এই বিদ্যার উপদেষ্টা; ইহা গুহ্য বিদ্যারূপে পরিগণিত।

কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার সংবাদেও আমরা জন্মান্তর-বিদ্যার সন্ধান পাই। "হে গৌতম! তোমাকে আমি গুহ্য সনাতন ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিব, এবং মৃত্যুর পর আত্মার যে কিরূপ গতি হয় তাহাও বলিব। কোন্ কোন্ জীব শরীরধারণ করিবার জন্য মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, কাহারাই বা স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত হয় তাহাও বলিব। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ যেরূপ অনুভূতি সে সেইরূপ গতিই প্রাপ্ত হয়" (২-২-৬, ৭)।

প্রশ্নোপনিষদেও আমরা এই ভাবের শ্রুতি দেখিতে পাই। "সে যদি ওঁকারের একটি মাত্রা অধ্যয়ন করে,

তবে সে সত্বরই এই জগতে ফিরিয়া আইসে। ঋক্ তাহাকে মনুষ্য লোকে উপনীত করে। সে এখানে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া মহিমা অনুভব করে। আর যদি সে ওঁকারের দ্বিমাত্রা মনে উপলব্ধি করে, তবে সে যজুর্মন্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষে সোমলোকে নীত হয়; সোমলোকে যাবতীয় বিভূতি ভোগ করিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আইসে" (৫-৩,৪)।

মুণ্ডকে দেখিতে পাই "যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয়ঃ জ্ঞান-তত্ত্ব না জানিয়া কর্ম্মকাণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত থাকে, তাহারা দেহান্তে স্বর্গলোকে পুণ্যফল ভোগ করিয়া পুনরায় ইহলোকে—সময় সময় ইহা অপেক্ষাও হীন লোকে ফিরিয়া আইসে" (১-২-১০)।

ঐতরেয় উপনিষদে দেখিতে পাই "তাহার এক আত্মা পুত্ররূপে তাহার প্রতিনিধিরূপে এখানে অবস্থান করে, অন্য আত্মা (সে স্বয়ং) কৃতকৃত্য হইয়া এই দেহ ছাড়িয়া প্রস্থান করে এবং পুনরায় ইহলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে" (২-৪)। বুঝিতে পারা গেল পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব বৈদিক-যুগে অপরিচিত ছিল না। বিশ্বাস করিত অনেকে কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম ছিল অতি অল্প লোকে। তার পরে যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারা জন্মমৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া পরম

কৈবল্য-পদ লাভ করিতেন। যাহারা কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত থাকিত সেই সাধারণ লোক আপন আপন শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে. দেহান্তে ভোগক্ষয়ে উত্তম-অধম লোকে জন্ম-গ্রহণ করিত। কর্ম্মফলানুসারে উভয়দিকেই গতি অব্যাহত ছিল।

উপনিষদের সার ভাগ যে গীতা, তাহাতে জন্মান্তরবাদ-রহস্য তো বহুভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। “জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ। ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।” জন্মিলেই মরিতে হইবে। মৃত ব্যক্তিরও আবার পূর্ণ মুক্তিলাভের পূর্ব্বে বার বার জন্মগ্রহণ

গীতা

‘বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন’ হে অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। অন্যত্র “সেই সমস্ত পুণ্যকারী জীব স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গিয়া দেবভোগসমূহ ভোগ করে। পরে বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। সকাম কর্ম্মীগণ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে পুনঃ-পুনঃ গতাগতি লাভ করিতে থাকে” (৯।২০-২২)। ইহা ছাড়া কর্ম্মানুসারে দেহান্তে শুক্ল-কৃষ্ণ গতিলাভের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। কিভাবে অনাসক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মবন্ধের জন্মমৃত্যু-রহস্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, গীতা সে

তত্ত্বও অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাভারত ও রামায়ণ এবং অন্যান্য স্মৃতি ও পুরাণাদি-গ্রন্থে পুনর্জ্জন্ম-রহস্য উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। সে সব বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া চিঠির কলেবর বৃদ্ধি করা কোন মতেই সঙ্গত মনে হয় না। আসল কথা, হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব অভ্রান্ত সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে পুনর্জ্জন্মবাদ এমন ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে যে, কর্ম্মফলবাদ বা পুনর্জ্জন্মবাদের উপরই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি করিয়া জন্মমৃত্যুর হাত

বৌদ্ধধর্ম্ম

হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে তাহাই যে বৌদ্ধধর্ম্মের সার উপদেশ। বুদ্ধদেব স্বয়ং কতবার কতরূপ বিচিত্র দেহ ধারণ করিয়া ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থাদি তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। যে পর্য্যন্ত বাসনারূপ সংসারবীজ সমূলে বিনষ্ট হইয়া সমস্ত জাগতিক ভাব, জাগতিক সংস্কার শূন্যে বিলয়প্রাপ্ত না হইয়া পূর্ণ নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ না করা যায়, সে পর্য্যন্ত জীব জন্ম-মরণচক্রে ভ্রামিত হইয়া সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে কষ্ট পাইতে বাধ্য। এই জন্মমৃত্যুময় সংসারচক্র হইতে অব্যাহতিলাভের জন্যই তো বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গ সাধনমার্গের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপদের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দেখিতে পাই

"প্রমত্তচিত্ত মানবের তৃষ্ণা মালবার লতার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বনে ফলাভিলাষী মর্কট যেমন অহরহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে, তৃষ্ণাচালিত মানবও তেমনি পুনঃপুনঃ জন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধিলাভ করিয়া জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থায় গিয়া যে গাথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপদের সে বর্ণনাটি জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। "এই দেহ-রূপ গৃহনির্ম্মাতাকে খুঁজিয়া পাইবার পূর্ব্বে কতবার জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুময় দুঃখ ভোগ করিয়াছি। হে গৃহকারক! এইবার যখন তোমার দেখা পাইয়াছি, তখন আর তুমি পুনরায় গৃহনির্ম্মাণে সমর্থ হইবে না। তোমার সকল কৌশল ধরা পড়িয়াছে—গৃহকূট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণগত আমার চিত্ত হইতে সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। জন্ম-মৃত্যুময় সংসারকে পরমনির্ব্বাণ অবস্থা হইতে নিকৃষ্ট দেখাইতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ইহাকে একান্ত-ভাবে আস্তে আস্তে এমন ভীষণ করিয়া তুলিলেন যে, এমন কি তাহার সান্নিধ্যে ভগবৎলীলাপরায়ণ হিন্দুগণও সংসারকে ভগবৎঅনুভূতির মুক্তিলাভের সহায়রূপে গ্রহণ না করিয়া বেদের সার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সংসারকে অসার ও বন্ধনের কারণ বলিয়া এমনভাবে গ্রহণ করিলেন যে, শঙ্করের ব্রহ্মবাদ সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি, চৈতন্যের লীলাবাদ অবতারবাদ

সগুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন সাম্যভাব সংস্থাপনে সক্ষম হইল না। আসল কথা, বৌদ্ধধর্ম্ম পুনর্জন্ম-বাদকে গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তিত ও শোধিত করিয়া সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিরূপে স্থাপন করিতে গিয়া স্থানে স্থানে মাত্রা হারাইয়া অতিরঞ্জনের ভিতর দিয়া বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রাচীন মিশরে পুনর্জন্মবাদ প্রচলিত ছিল। জোহার পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সকল আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য। কেথার মল্‌ক্রথও পুনর্জন্ম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর সম্প্রদায়ে ইহা ধর্ম্মমতের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল।

যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম ইউরোপ গ্রাস করিয়া বসিল, তখন ইহার প্রধান প্রধান প্রচারকগণ পুনর্জন্মবাদে বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন। মধ্যযুগে যখন একটা অজ্ঞানতার অরাজকতার প্রবল স্রোত আসিয়া সমস্ত ইউরোপকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল, তখন যাবতীয় সুন্দর সুন্দর দার্শনিক মত ও ধর্ম্মভাবগুলির সঙ্গে পুনর্জন্মবাদও ইউরোপ হইতে অন্তর্হিত হইতে বসিল। ইহা ব্যতীত রাজা মহারাজারাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুনর্জন্মবাদকে কর্ম্মফল-

বাইবেল

বাদকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলকেও এই উদ্দেশ্যে অনেকবার নানারূপে যথাসম্ভব পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মে পুনর্জন্মবাদের স্থান নাই, একথা আমরা মানিতে পারি না। প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্ম পুনর্জন্মবাদমূলক। যীশু নিজে পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট সম্বন্ধে যখন ইহুদীসমাজে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখন যীশুখৃষ্ট নিজে বহুবার আকার-ইঙ্গিতে দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্মশিক্ষক ইলায়াসই (Elias) 'জন' রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যীশুকে পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যগণ কখনও 'জন' রূপে কখনও 'ইলায়াস' রূপে অনুমান করিতেন (ম্যাথু ১৬-১৩,১৪)। আর এক স্থানে যীশু স্বয়ং বলিয়াছেন 'ইলায়াস অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাঁহার প্রতি সৎব্যবহার করে নাই'।...পরে শিষ্যগণ জানিতে পারিলেন যে যীশু জনের সম্বন্ধেই এই কথাগুলি বলিয়াছেন (ম্যাথু ১৭।১০-১৩)। এতদ্ব্যতীত আমরা বাইবেলের রিভিলেসনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ সূত্রে, কোরিনথিয়ানসের পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ সূত্রে এবং গালেটিয়ানসের ষষ্ঠাধ্যায়ের সপ্তম সূত্রে পুনর্জন্মের বিশেষ আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমরা বোধ হয় প্রমাণ করিতে সক্ষম যে, যতদিন পর্য্যন্ত

খ্রীষ্টধর্ম্ম গির্জ্জায় সীমাবদ্ধ হইয়া ভগবান যীশুকে যীশুর ধর্ম্মকে ভুলিয়া গিয়া কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে পর্য্যবসিত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা খ্রীষ্টসেবকদের ভিতরে দিব্য পিতৃস্নেহ ও যীশুর উদারধর্ম্মনীতি আস্বাদ করিবার সুযোগ লাভ করিতাম। তদানীন্তন মহাত্মাগণের উপদেশের মধ্যে আমরা পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ দেখিতে পাই। খ্রীষ্টিয়ান 'বাবা'দের (Fathers) মধ্যে পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস কতকটা সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান ছিল। জিরোম ও অরিজেন প্রভৃতির রচনা ইহার সাক্ষী। যীশু তাঁহার অজ্ঞাত-বাস কালে ভারতের ও তিব্বতের সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট যে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিব্বতের হিমিন-মঠে পালি ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।* এই 'অজ্ঞাত যীশু-জীবনী' দ্রষ্টব্য। বিশিষ্ট কঠোর আইন প্রস্তুত করিয়া কন্‌ষ্টান্টিনোপলের মহাসভাকে পুনর্জ্জন্মপ্রচার-প্রথা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। "যে কেহ প্রাচীন পুনর্জ্জন্মবাদকে পোষণ করিবে তাহাকে দেশের শত্রু মনে করিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে।" ইহার

*"The Unknown Life of Christ" by Nicholus Notivich. Translated from the French by Violet Cripse. London. 1895.

প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম এমন মহান্ সত্য হইতে বঞ্চিত হইল। * ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল হইতে পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব উঠাইয়া দিবার জন্য বহু বৎসর যাবৎ যে বিপুল আয়োজন ও অনুষ্ঠান চলিয়াছিল, তাহারই ফলে খ্রীষ্টধর্ম্ম আজ কর্ম্মবাদের উপযুক্ত মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইয়া অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাইবেল হইতে পুনর্জ্জন্মবাদের কথা তুলিয়া দিতে, আইন দ্বারা দেশ হইতে উহা লোপ করিয়া দিতে কত সময় যে কত নির্ম্মমভাবে চেষ্টা করা হইয়াছিল, মিসেস্ বেসান্তের গ্রন্থও তাহার পরিচয় প্রদান করে। আবশ্যক বোধে বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করিতে গিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকে যে শ্রীহীন বিকৃত অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ জ্ঞানপিপাসুর নিকট হতশ্রদ্ধ করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ছিল ভগবৎবিধান দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত সারতত্ত্ব, সেই ধর্ম্ম আজ দর্শন-বিজ্ঞানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে শশব্যস্ত। ভগবান যীশু পুনর্জ্জন্ম

* In the sixth century, the Council of Constantinople issued the following :—"Whosoever shall support the mythical presentation of the pre-existence of the soul and the consequently wonderful opinion of its return, let him be an anathema." Thus the christian doctrine of the pre-existence of the soul received its death blow in the western world (The theosophist. oct. 1902).

অস্বীকার করেন নাই বরং মানিয়া লইয়াছেন। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণও উপদেশ দিতেন। বর্ত্তমান খৃষ্টসমাজ যীশুকে যীশুর পবিত্র জীবন পবিত্র ধর্ম্ম ও সাধনপ্রণালীকে বিসর্জ্জন দিতে গিয়া পুনর্জ্জন্মরহস্যকেও খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।

কোরাণ

এখন দেখা যাউক, পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম কি অভিমত প্রকাশ করেন। কোরাণে পুনর্জ্জন্মের উল্লেখ নাই একথা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ ও মানুষমাত্রের উপর সুন্দর একটা ভ্রাতৃভাবে মুগ্ধ হইয়া কোনও বিখ্যাত মুসলমান সাধকের সঙ্গে বাস করিয়া এক সময় কোরাণের ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার একটু সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম লইয়া অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা চলিত। আমাদের বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল আজকাল হিন্দুসমাজে যে ধর্ম্ম সুপরিচিত তাহা যেমন বৈদিক পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম নহে, তেমনই মুসলমানসমাজে যে ধর্ম্ম সুপরিচিত তাহাও পবিত্র কোরাণের জীবন্ত ধর্ম্ম নহে। তিনি বলিতেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য পরবর্ত্তী মুসলমান সাধক-পণ্ডিতগণকে পর্য্যন্ত কোরাণের কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যা বাহির করিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের মধ্যে বাহাত্তর কি

তিয়াত্তরটি শাখা আছে। তাহার মধ্যে রাফজিয়া সম্প্রদায়ের অষ্টম-শাখা প্রকাশ্যভাবে পুনর্জন্ম স্বীকার করেন। ইস্‌মাইলি সম্প্রদায়ও (বোরাঃ ও খোজাঃ যাহার অন্তর্গত) পুনর্জন্মবাদ ও কর্ম্মবাদ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই আবার হাজরত মহম্মদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর কাহারও মতে মহম্মদের জামাতা হাজরত আলিই শ্রীকৃষ্ণের অবতার। ইরাণের 'বিহার'-সম্প্রদায় বলেন, তাঁহাদের আবদুলবেহা খ্রীষ্টের অবতার। সুফী কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই পুনর্জন্ম মানিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত অনেকটা বেদান্তের অদ্বৈতবাদের অনুরূপ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় মুসলমানদের মধ্যেও সকলে পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করিতেন না। মহম্মদ ও তাঁহার প্রধান প্রধান ভক্ত জীবন্ত বিশ্বাস ভগবৎভক্তি সর্ব্বজীবে প্রেমভাব দ্বারা যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে সে ধর্ম্ম বুঝিতে বুঝাইতে প্রচার করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রাচীন মুসলমান সাধকগণের অনেকে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে অস্বাভাবিক ভাবে একটা পার্থক্য প্রমাণ করিতে গিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জন্ম প্রভৃতি অনেক উচ্চ তত্ত্বকে পরে অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাধক জ্ঞানী সুফীগণকে এজন্য সাধারণতঃ গোঁড়া মুসলমান হইতে দূরে বাস করিতে হইত। মহম্মদের

মতেও কোরাণের একটা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ভাব আছে। আরব দেশের অবিশ্বাসী অজ্ঞ অধিবাসীদিগের নিকট তাঁহাকে অনেকটা সতর্ক হইয়া ধর্ম্মমত প্রচার করিতে হইত।

রূমীর গুরু সামস্থদ্দীন তাব্রেজী বলিয়াছেন "আমি একটি আত্মা, কিন্তু আমার হাজার হাজার দেহ আছে। তবুও আমি উপায়হীন; কারণ আমি অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিনা, আমার মুখ বন্ধ হইয়া আইসে। আমি আমার দুই হাজার জন্ম দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কোন জন্মেই আমি এতটা ভাল হইতে পারি নাই"।

আল্লার সঙ্গে অভেদবাদী (Inal Haq) মনস্থর বলিয়াছেন "আমি এই পুষ্পশোভিত নদীতীরে বহুবার জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি। শত সহস্র বৎসর আমি জীবিত ছিলাম কাজ করিয়াছিলাম, নানারূপ দেহ লইয়া উন্নতিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলাম"। সুবিখ্যাত সাধক সিদ্ধ মহাত্মা জালালুদ্দীন রুমীর উক্তিও এ বিষয়ের জ্বলন্ত সাক্ষী। তিনি তাঁহার মেসনাভি-গ্রন্থে ইহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।* তিনি বলেন "আমি স্থাবর-দেহ ত্যাগ করিয়া উদ্ভিদ-জন্ম লাভ করি। সেখানে মরিয়া জন্তুদেহে আবির্ভূত হই। জন্তুদেহ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যদেহ লাভ করি। কাহা

---

* I died from the mineral and became a plant,
I died from the plant and reappeared in an animal,
I died from the animal, and became a man,
Wherefrom then should I fear ?

হইতে আমি আর ভয় প্রাপ্ত হইব। কখন্ আমি মৃত্যুর ভিতর দিয়া নিম্নগতি প্রাপ্ত হইয়াছি? ইহার পরে আমি মরিয়া দেবদেহ লাভ করিব। সেখান হইতেও আমি উন্নতির আশা করিব। আমার নিকট হইতে তাঁহার মুখ-শোভা ছাড়া আর সব বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তার পরে একবার আমি দেবতাদেরও উপরে চলিয়া যাইব। এমন হইব, যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না মনে চিন্তা করা যায় না। তখন যে সব শূন্য। তখনকার বীণা ঘোষণা করিবে. সত্য সত্য আমরা তাঁহার নিকটে গিয়া পৌছিয়াছি"। রুমীর এই ভাবের উক্তির কারণ আমরা কোরাণেও দেখিতে পাই। "তুমি কি তাঁহাকে বিশ্বাস কর না, যিনি তোমাকে প্রথমে ধূলা হইতে তারপরে কীটাণু হইতে সর্ব্বশেষে পূর্ণ মানবরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন?" ১৭-৩৭। সুফীদের মধ্যে তো পুনর্জন্মের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান

When did I grow less by dying ?
Next time I shall die from the man,
That I may grow the wings of the Angels'.
From the Angel too must I seek an advance.
All things shall perish save His face.
Once more shall I wing my way above the Angels :
I shall become that which entereth not the imagination,
Then let me become naught, naught,
For the harp string
Crieth unto me ; "Verily into Him shall we return".
Jalal-ud-din Rumi's Masnavi IV.

কোরাণ-গ্রন্থেও যে ইহার উল্লেখ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, একথা বোধ হয় কেহই জোর করিয়া বলিতে সাহসী হইবেন না। "পরমাত্মা (আল্লা) জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বারে বারে পাঠাইয়া দেন, যে পর্য্যন্ত না তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া পৌঁছায়।"*

"যাহারা আল্লার বিধানে হত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না; তাহারা বাঁচিয়া আছে, যদিও তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না।" ২-১৫৪। এখানে বাঁচিয়া থাকার অর্থ কেহ বলেন সূক্ষ্মদেহে স্বর্গে, কেহ বলেন পরজন্মে অন্য দেহে।

"তুমি কি করিয়া আল্লাকে অস্বীকার কর? তুমি মৃত ছিলে তিনি তোমাকে জীবনদান করিয়াছেন। ইহার পরে তিনি আবার তোমাকে মারিয়া ফেলিবেন এবং পুনরায় জীবিত অবস্থায় আনয়ন করিবেন, সর্ব্বশেষে তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাওয়া হইবে।" ২-২৪

এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "হে প্রভু, তুমি মৃতকে কি করিয়া জীবন দান কর তাহা আমাকে দেখাও"। তদুত্তরে আল্লা বিরক্তির সহিত বলিলেন "তুমি কি এ সব বিশ্বাস কর না?" ২-২৬০

* God generates beings and sends them back over and over again till they return to Him.—Al Koran xxx।

"আল্লাই সত্যস্বরূপ, তিনি মৃতের ভিতর জীবন সঞ্চার করিতে পারেন ; তাঁহার সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব আছে। যাঁহারা কবরে আছেন আল্লা তাঁহাদিগকে তুলিয়া লইবেন।" ৬২-৬

"আল্লা তোমাকে মাটী হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি আবার তোমাকে মাটীতে ফিরিয়া পাঠাইবেন ; তাহার পরে তিনি তোমাকে একটা নূতন জীবনে লইয়া যাইবেন।"৭১-১৭,১৮

"তুমি দিনকে রাত্রে লয় কর আবার রাত্রিকে দিনে লয় কর, তুমি মৃত হইতে জীবন্তকে লইয়া আইস আবার জীবন্তকে মৃতে লইয়া যাও।" ৩-২৬

"হে মানব, নিশ্চয়ই প্রভুর কাছে যাইতে তোমাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইবে।" ৮৪-৬..."নিশ্চয়ই সে আর ফিরিয়া আসিবে না।" ৮৪-১৪..."তুমি নিশ্চয়ই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইবে।" ৮৪-৯..."তুমি এই দেহবন্ধন হইতে (from the obligation of the *city*) নিশ্চয়ই একদিন মুক্তি লাভ করিবে।" ১০-৪৪

কোরাণের এই সব সুরা হইতে আমরা পুনর্জন্মের অনেকটা আভাস পাইয়া থাকি। সম্প্রদায়বিশেষে এইগুলির একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির করিয়া কোরাণ হইতে পুনর্জন্মবাদ উড়াইয়া দিতে চান। একজন মুসলমান-সাধক আমাকে বলিয়াছিলেন 'কবরে গিয়া বাস করা সেখানে হইতে

উঠিয়া আসা প্রভৃতি তত্ত্বের মধ্যেও আমি পুনর্জ্জন্মলাভের রহস্য আস্বাদ করিবার সুযোগ পাই'। স্থানবিশেষে এই স্থূলদেহে বাস করাকেও নাকি কবরে বাস করা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা কোনও মুসলমানকে পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি না, কারণ তাঁহাদের শাস্ত্রে আমাদের অধিকার অতি সীমাবদ্ধ। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বিজ্ঞান যেরূপ গতিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে পুনর্জ্জন্মবাদকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে প্রমাণ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হওয়া বিচিত্র নহে। সে সময়ও ইস্‌লাম-ধর্ম্মকে আমাদের মতে ভ্রমযুক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত মনে হইবে না। মুসলমান ভ্রাতাদের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে তাঁহাদের সাধক সুফীগণের পুনর্জন্মে বিশ্বাসটা কোরাণ-সঙ্গত কি না। যে তত্ত্ব প্রায় সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মের অনুমোদিত তাহাকে বিনা বিচারে শুধু গায়ের জোরে অস্বীকার করিতে যাওয়া যে বিদ্যার পরিচায়ক নহে, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। যাহার উল্লেখ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা প্রাচীন পণ্ডিত-সাধকগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত, যাহার বিপক্ষে বিজ্ঞান কিছু বলিবার কথা খুঁজিয়া পায় না, তাহার মধ্যে কোনও সত্য লুক্কায়িত আছে কিনা তাহা সাধক-ভক্তদের বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

বিজ্ঞানে জন্মান্তর

জন্মান্তর-রহস্য লইয়া বিচার করিতে হইলে কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে জন্ম জিনিসটা যে কি ব্যাপার তাহা কতকটা বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাচীন ঋষিদের, এমন কি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে জগতের সব তত্ত্ব যে একই নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে একই তালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একের জ্ঞান এবং সকলের জ্ঞান এমন আশ্চর্য্যভাবে সম্বদ্ধ যে এককে ঠিকভাবে জানিতে হইলে সবকে এবং সবকে জানিতে হইলে এককে জানা একান্তভাবে আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং মানুষের জন্ম সম্বন্ধে কিছু জানিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে আমরা জগতের জন্ম জাগতিক সব পদার্থের জন্ম স্থাবর-জঙ্গম আদি সব পদার্থের সব জীবের জন্ম সম্বন্ধে একটু

জন্মতত্ত্ব

আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। যদিও এ সকল আলোচনার মধ্যে প্রাচীন ঋষিদের মতকেই আমরা সমীচীন মনে করি, যদিও সূক্ষ্মতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের অসংযত সংস্কার-রঞ্জিত মনের কল্পনাজল্পনা অপেক্ষা অতীন্দ্রিয়দর্শী দিব্য দর্শন-প্রাপ্ত সংযত শুদ্ধ শান্ত তত্ত্বদর্শনকারী ঋষি-মুনিদের অনুভূত সত্যগুলিকে আমরা অনেকটা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি, তবুও তাঁহাদের দোহাই দিয়া কোনও কথা প্রমাণ করিতে না গিয়া আমরা যথাসম্ভব যথাশক্তি বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সাহায্যে জন্মাদি-সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলিকে বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা করাই বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

জন্ম ও মৃত্যুলীলা জগতের সৃষ্টি ও লয়-ব্যাপার একই-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রকৃত তত্ত্বের মধ্যে আমরা দুইটি জিনিস দুইটি ভাব দেখিতে পাই। একটা অচিন্ত্য অব্যক্ত গুণাতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরাকার নিরঞ্জন ভাব, আর একটা অনুমেয় ব্যক্ত সগুণ সক্রিয় সাকার লীলাত্মক ভাব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও যেন একই তত্ত্বের দুই দিক বলিয়া মনে হয়। যিনি অবস্থাবিশেষে নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তিনিই যেন আবার অবস্থার পরিবর্ত্তনে সগুণ সক্রিয় বলিয়া প্রতিভাত হন। এই দুই ভাবের কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে তাহা বলা কঠিন হইলেও

দর্শন-শাস্ত্র বিজ্ঞান-শাস্ত্র কিন্তু অবিশেষ হইতে বিশেষের উৎপত্তি 'অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ' (সাংখ্য-সূত্র), অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের অভিব্যক্তি 'অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ' (গীতা), সত্ত্ব-রজস্তমের সাম্যাবস্থা-রূপ অবিশেষ প্রকৃতি হইতে মহদাদি বিশেষ-ভাবাপন্ন প্রকৃতির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদেও নির্ব্বিশেষ নিত্য সর্ব্বগত শান্ত অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব হইতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল ক্ষিতি আদি যাবতীয় বিশেষ তত্ত্বের উদ্ভব দেখান হইয়াছে। সদেব অসদেব বা সৌম্য ইদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং, তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ ইত্যাদি ভাবের বাক্য দ্বারা সেখানে অব্যাকৃত অব্যক্ত তত্ত্ব হইতে ব্যক্ততত্ত্বের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও আমরা এই তত্ত্বই দেখিতে পাই 'অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং' সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অপ্রকেত অব্যক্ত সলিল কারণার্ণব মাত্র অবশিষ্ট ছিল (১০-১২৯-৩)। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্রও এক অব্যাকৃত অব্যক্ত অবিশেষ (Homogeneous) আদিম অবস্থা হইতে ব্যাকৃত ব্যক্ত বিশেষ-ভাবাপন্ন (Heterogenous) বিশ্বের বিকাশ-প্রাপ্তিই স্বীকার করেন। বেদ বলেন ইহাকে অপ্রকেত সলিল, সাংখ্য বলেন প্রকৃতি, পুরাণ বলেন কারণার্ণব.; আর বিজ্ঞান বলেন অবিশেষ আকাশতত্ত্ব 'প্রোটাইল'। বেদ এই তত্ত্বকে রয়ি বা অন্ন বলিয়া ইহার ভিতরে অণু-

প্রবিষ্ট প্রাণশক্তির বৈজ্ঞানিক শক্তিতত্ত্বের (energy) অবস্থিতিও দেখাইয়া গিয়াছেন। সৃষ্টি দেখাইতে হইলেই অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ-তত্ত্ব দেখাইতে হইবে।

এই নির্ব্বিশেষ ইথার-সাগর মথিত হইয়া যে ভাবে অসংখ্য তাড়িতাণু (Elctron) বুদ্‌বুদ্‌রূপে ভাসিয়া উঠিয়া সবিশেষ-ভাব প্রাপ্ত হইল, তাহা ঋগ্বেদের অপ্রকেত সলিলে দেবগণের প্রাণশক্তির ছন্দানুবর্ত্তী নর্ত্তন হইতে জগতের উৎপত্তিতত্ত্ব বুঝিতে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। পুং-স্ত্রীভাবাপন্ন (Positive ও Negative) তাড়িতাণুগুলি অর্থাৎ প্রোটন ও ইয়ন-তত্ত্বদ্বয় ঋগ্বেদের অন্নাদ ও অন্ন প্রাণ ও রয়িতত্ত্বেরই মহিমা প্রচার করিয়া থাকে। বিজ্ঞানে এই দুই তত্ত্বের সংমিশ্রণে ও বিচিত্র-ভাবের কম্পনে যেমন জাগতিক সব পদার্থের উৎপত্তি সাধিত হয়, বেদের প্রাণ ও রয়ির মিশ্রণে এবং বিচিত্র কম্পনেও ঠিক সেই ভাবে দেবতাদিগের—বিভিন্ন তত্ত্বের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বিজ্ঞানমতে জড় ও চেতন (Inorganic ও Organic) এই উভয় সৃষ্টির মূলে একই ভাবের পরমাণু ও কোষাণু (Cell) দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বেদের মতে সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই একই তালে একই ছন্দে একই উপাদানে গঠিত। বিজ্ঞানের মতে জড়-সৃষ্টি প্রাণহীন, সুতরাং চেতন-সৃষ্টিতে এই প্রাণবস্তুটি কোথা হইতে কি ভাবে আসিয়া

দেখা দিল, ইহা তাহার বুদ্ধির অনধিগম্য। বেদ সর্ব্বভূতে প্রাণের, এমন কি পরমাত্মার অস্তিত্বও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে ভাবে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে জড়েও প্রাণশক্তির অধিষ্ঠান শীঘ্রই একটা বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইবার সম্ভাবনা মনে হয়। স্যর অলিভর লজও প্রাণতত্ত্ব যে জড়কে অনুপ্রাণিত করে, প্রাণ যে জড়শক্তির অবস্থান্তর বা উৎপাদ্য নহে, প্রাণশক্তি যে বংশানুগতিক্রমে শতধা বিভক্ত হইয়াও নিত্য অবিনাশীরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহা বেশ সুন্দরভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রাণ যে বিনষ্ট হয় না, এই বৈদিক-তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতে আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক সচেষ্ট।

হিন্দুমতে সমস্ত পদার্থের মধ্যেই আত্মা অবস্থিত। তাহার উপরে পঞ্চকোষের পাঁচটি আবরণ সেই আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সব পদার্থের আবরক এই কোষগুলি এক-একটি করিয়া খুলিয়া যাওয়াই হিন্দুদের মতে ক্রমবিকাশ। জড়পদার্থের পাঁচটি কোষই পূর্ণভাবে অব্যাকৃত, তাই সেখানে প্রাণশক্তির বিসদৃশ উপাদানগুলি গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইবার কোনও লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। চেতন পদার্থের মধ্যে প্রাণময়-কোষ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে, তাই

প্রাণের পঞ্চ প্রাণের ধর্ম্মগুলি আমরা সেখানে দেখিতে আরম্ভ করি। প্রাণের দ্বারা তাহারা বিজাতীয় আহার আত্মসাৎ করিয়া আপন আপন দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্পাদন করে। অপানের সাহায্যে তাহারা অনাবশ্যক জিনিসগুলি বর্জ্জন করিয়া থাকে। এই প্রাণ-অপানের আদান ও বিসর্গের কাজ-গুলিকে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অ্যানাবলিজম্ (anabolism) ও ক্যাটাবলিজম্ (Katabolism) নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শিশুদেহের বর্দ্ধন আবশ্যক বলিয়া সেখানে আদান-ক্রিয়া বলবতী, বৃদ্ধদেহে ক্ষয়ক্রিয়া প্রবল বলিয়া সেখানে বিসর্গ-ক্রিয়া বলবতী ; যুবা-দেহে আদান ও বিসর্গ সমভাবে কাজ করিতে থাকে। সমান উদান ও ব্যান-বায়ুর কাজ বিজ্ঞান এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্যতে উহাদের কাজগুলিও যে বৈজ্ঞানিক চেতনপদার্থের ভিতরে দেখিতে আরম্ভ করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। প্রাচ্য মতে উদ্ভিদ জাতিতে প্রাণময়-কোষ বিকাশ পাইতে আরম্ভ করে ; তাহার পরে নিম্নশ্রেণীর জীব মধ্যে মনোময়, উচ্চশ্রেণীর জীবে বিজ্ঞানময় এবং দেবতাদের মধ্যে আনন্দময়-কোষের পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কৈবল্যপ্রাপ্ত সিদ্ধ মহাত্মাগণ কোষাতীত দেহাতীত বিদেহ অবস্থা লাভ করেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে

পারেন নাই জড়ের মধ্যে কি করিয়া কোথা হইতে প্রাণের সঞ্চার হইল। এই তত্ত্ব লইয়া বিজ্ঞান বিবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা প্রাচ্যতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের জীবতত্ত্ব-গবেষণায় অনেকটা সাহায্য পাইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীব-রাজ্যের ক্রমবিকাশ সরীসৃপ পক্ষী পশু বানর ও মনুষ্য-রূপ পরিণতির ভিতর দিয়া দেখাইয়া থাকেন। প্রাচ্য ক্রমবিকাশও যে কতকটা এইজাতীয়, বিষ্ণুপুরাণের চৌরাশি যোনি-ভ্রমণবৃত্তান্ত তাহার সাক্ষী। সেখানে দেখিতে পাই ২০ লক্ষ স্থাবর, ৯ লক্ষ জলজ, ৯ লক্ষ কূর্ম্ম, ১০ লক্ষ পক্ষী, ৩০ লক্ষ পশু ও ৪ লক্ষ বানর-যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হয়; ইহার পরে ব্রহ্ম-যোনিপ্রাপ্ত হইয়া জীব কৈবল্য লাভ করে। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন আদি অবতার-ক্রমও এই মতের পোষক বলিয়া অনেকে মনে করেন। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-মতে বিবর্ত্তবাদ (evolution) দেহগত, প্রাচ্য মতে উহা জীবগত। পাশ্চাত্য মত সত্য হইলে পুনর্জ্জন্মের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা তত দেখিতে পাওয়া যায় না, আর প্রাচ্য মত সত্য হইলে পুনর্জ্জন্মবাদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে; এজন্য আমরা এ বিষয় লইয়া একটু আলোচনা করিতে চাই।

পাশ্চাত্যমতে উত্তরাধিকার নিয়ম (Law of Heredity)

নৈসর্গিক নির্ব্বাচন (Natural Selection) ও ইহারই কতকটা অন্তর্গত যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the Fittest), এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ (Pressure of Environment)—এইকয়টি তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। এই উত্তরধিকার নিয়মের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা ফরাসী বৈজ্ঞানিক লমার্ক। শুক্র-শোণিতের মিলন হইতে পিতা-মাতার গুণ পুত্রে সংক্রামিত হয় বলিয়া ডার্বিন ইহার নাম রাখিয়াছেন একই বীজের পুনরাবর্ত্তন (Pangenesis)। হার্বার্ট স্পেনসার এই মতের পোষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বংশপরম্পরা ক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ সংস্কারপুঞ্জই সন্ততিতে সংক্রমিত হইয়া জাতির উন্নতির সহায় হয়। জার্ম্মানির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিসম্যান (Weismann) অকাট্য যুক্তি দ্বারা ডার্বিনের মত খণ্ডন করিয়া বিজ্ঞানেব ধারা অন্য দিকে প্রচালিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে প্রত্যেক বীজ-ভ্রূণাণুর (Zygote) বাহিরের অংশে একটি শরীরারম্ভক কোষাণু (Somatic বা Body-cells), আর ভিতরের দিকে একটী সন্তানোৎপাদক কোষাণু (Germ-cell), বর্ত্তমান থাকে। সন্তানোৎপাদক কোষাণুটী পুং-শিশুর মুষ্ক (Testicles) এবং স্ত্রী-শিশুর ডিম্বকোষে (Ovary) সযত্নে গোপনে সুরক্ষিত থাকে। আমাদের দৈনিক জীবনগত কার্য্য-কলাপের সহিত ইহার

কোনও সম্বন্ধ থাকে না। শরীরারম্ভক কোষাণুটী তিনটী স্তবকে বিভক্ত হইয়া ভ্রূণস্থ শিশুর স্নায়ু ও চর্ম্ম, পেশী ও অস্থি এবং যকৃৎ ও ফুসফুস আদি যন্ত্রের সৃষ্টি করে। যৌবন কালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের শরীরে সুরক্ষিত ঐ সন্তানোৎপাদক কোষ হইতে মিলনযোগ্য পুং-বীজাণু ও স্ত্রী-বীজাণু একত্রিত হইয়া একটি নূতন ভ্রূণের সৃষ্টি করে। এইভাবে সৃষ্টির মূল বীজ বংশপরম্পরায় পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ডার্বিনের বিখ্যাত শিষ্যগণ পর্য্যন্ত এখন পিতামাতার মানসিক গুণ আদি উত্তরাধিকারক্রমে সন্তানে সংক্রমিত হওয়া অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র আস্তে আস্তে বিবর্ত্তন-বাদ (evolution, theory) যে দেহগত নহে—জীবগত, প্রাচ্যের এই মতগ্রহণের অনুকূল হইয়া পড়িতেছেন। এদিকে আবার ডি ভ্রাইস (De Vries) প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রকৃতি যে প্রাণিদেহ গঠনাদি ব্যাপারে কখনও লাফাইয়া চলেন না (never leaps) কিন্তু ধীর মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন, ডার্বিনের এই মত দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছেন। ডার্বিন প্রমুখ বিবর্ত্তনবাদী বলিতেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে একই জন্তুর উত্তরাধিকারিগণ বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। বাঘ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া একদল

হরিণ ক্ষিপ্রগতি লাভ করিল, অপর একদল খাদ্যকৃচ্ছ্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া লম্বা গলা লাভ করিয়া জিরাফ নামে অভিহিত হইয়া পড়িল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ আবার প্রমাণ করিয়া বসিলেন যে ঐ পরিবর্ত্তনের বীজ হরিণের মধ্যেই বর্ত্তমান ছিল, অনুকূল পরিপার্শ্বিক অবস্থা আসিয়া ঐরূপ পরিণতিলাভের সহায় হইয়া পড়িল।

সমস্ত পদার্থের মধ্যে দুইটি শক্তি কাজ করে, একটি পুরুষের বিকাশ আর একটি প্রকৃতির পরিণতি। প্রকৃতির পরিণতির দিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দৃষ্টি রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে তিনি একেবারেই উদাসীন! স্বতন্ত্র স্বাধীন পুরুষ যেখানে প্রকৃতির স্তর ভেদ করিযা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন, সেখানেই সেই কাজকে আকস্মিক যাদৃচ্ছিক আদি নামে বৈজ্ঞানিক বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। পুরুষের দিকে না চাওয়ার ফলে জীব যে কিসে যোগ্যতম (fittest) হয়, তাহার উত্তর পাওয়া যায় না ; শুধু প্রকৃতি যে যোগ্যতমের সেবার জন্য ব্যস্ত যোগ্যতমের পরিণতির সহায়, তাহারই সামান্য একটু পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। প্রকৃতির লীলাটা হিন্দুমতে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নহে, উহার মধ্যে পুরুষের ইচ্ছা থাকার জন্য উহা পুরুষের প্রকাশের সেবার সহায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বর্গসঁ

অনেকটা প্রাচ্য মতের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাণীর প্রাণশক্তিই তাহার বিচিত্র শরীর নির্ম্মাণ করিতেছে। সমস্তের ভিতরেই যেন কেমন একটা মানসিক সঙ্কল্পের ব্যাপার (something of the psychological order) অনুভূত ও অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এক-একটি ইন্দ্রিয় এক-এক একটি বিচিত্র যন্ত্র প্রস্তুত করিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। বার্গসঁ বলেন মানুষ যেমন করিয়া অণুবীক্ষণ গড়িয়াছে, প্রাণশক্তি ঠিক সেইরূপে চক্ষুযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। বাহিরে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ রহিয়াছে। ইহাদিগকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রাণশক্তি কর্ণ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ও নাক সৃষ্টি করিয়া বসিল। এইজন্যই বোধ হয় বৈদিক ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন জীবের দর্শন করিবার ইচ্ছার ফলে চক্ষু, শ্রবণ করিবার ইচ্ছার ফলে কর্ণ,—এই ভাবে সমুদয় ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। দেহের দৈহিক যন্ত্রের পরিবর্ত্তনের নির্ম্মাণকৌশলের পিছনে রহিয়াছে একটা প্রাণশক্তির প্রেরণা, জীবাত্মার পরিস্পন্দন ভগবানের সঙ্কল্প। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্র ইহার অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা আশা করি যে একদিন বিজ্ঞানের সুন্দর মন্দিরে বসিয়া ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লাবণ্য ও প্রেমে পরিপূর্ণ সগুণ ব্রহ্মের এবং তাহার পশ্চাতে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন

পরব্রহ্মের পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিবার সুযোগ পাইব। বিজ্ঞান যে ভগবৎচিৎবিভূতি বেদেরই তত্ত্বানুসন্ধানে স্বরূপ অবধারণে মহিমাপ্রচারে—এক কথায় উপাসনা করিতে সদা নিরত, তাহা আমরা আস্তে আস্তে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। বার্গসঁ আকৃতির যদৃচ্ছাক্রমে (spontaneous) পরিবর্ত্তনসাধনের পিছনে প্রাণশক্তির ভিতর দিয়া যে বেদের ছন্দতত্ত্ব পরিস্পন্দন-রহস্য দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং হিন্দুর কারণ-কার্য্যসম্বন্ধ দেহী-দেহের সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আগে কারণ তাহার পরে কার্য্য, আগে দেহী তাহার পরে দেহ, আগে প্রাণ তাহার পরে ইন্দ্রিয়, আগে ভগবানের সংকল্প তাহার সঙ্গে জগতের পরিণতি বা বিবর্ত্তন-বাদ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution); ইহা জীবগত, দেহগত নহে। যাহা জীবের মধ্যে বীজরূপে অব্যক্ত ছিল, বিবর্ত্তনের ফলে তাহা এখন বৃক্ষরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল; সুতরাং বিবর্ত্তন বাহিরের স্থূলের জড়ের ব্যাপার নহে। ইহা অন্তরের সূক্ষ্মতমের আত্মার বহির্বিকাশ-বিশেষ। যাহা পূর্ব্বে কারণরূপে ছিল তাহাই এখন কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইল।

মেণ্ডেলের ধর্ম্মযাজক সামান্য মটরগাছের তত্ত্ব লইয়া

বিচারের ফলে বৈজ্ঞানিক জগতে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বসিলেন। তিনি প্রাংশু (tall) এবং বামন (dwarf) মটরের ভিতরে যৌন-সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেখিয়াছেন প্রথম পুরুষে সকলেই প্রাংশু হইল, একটিও বামন হইল না ; দ্বিতীয় পুরুষে সন্ততির বার আনা প্রাংশু এবং চারি আনা বামন হইল। তৃতীয় পুরুষে তিন ভাগের দুই ভাগ মাত্র প্রাংশু এবং এক ভাগ মাত্র বামন হইল। বীজের আকৃতি বর্ণ ও পুষ্পের সংস্থান সম্বন্ধেও তিন পুরুষের মধ্যে এইজাতীয় পরিবর্ত্তনই তিনি দেখিতে পান। ডার্বিনের মত সত্য হইলে তিন পুরুষে প্রাংশুত্ব-গুণ ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত ছিল। ইহা হইতে মেণ্ডেল সিদ্ধান্ত করেন যে সন্তান-বীজে কতকগুলি কলা (factors) প্রচ্ছন্ন থাকে, উহাদের মধ্যে কোনটি এক পুরুষে কোনটি বা দুই-তিন পুরুষে সন্ততির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়া পড়ে। যাহা অব্যক্ত (Recessive, Latent) ছিল, তাহাই উপযুক্ত সময় ও সুযোগ পাইয়া প্রবল ও ব্যক্ত (Dominant, Patent) হইয়া পড়িল। মনে হয় 'প্রকৃত্যাপূরাৎ' প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা সর্ব্ববিধ পরিণাম সাধিত হইতে পারে, পতঞ্জলির এই তত্ত্ব এখন বিজ্ঞান-রাজ্যে প্রমাণিত হইতে বসিয়াছে। ডি ভ্রাইস কোরেনস্ সেয়র ম্যাক্ প্রভৃতি স্বাধীনভাবে মেণ্ডেলের মত লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, এই মত

সমস্ত জীবজন্তু সম্বন্ধেও অকাট্যভাবে প্রযোজ্য। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বেট্‌স্‌ম্যান (Batesman) এখন এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইহাঁদের মতের সার কথা এই যে, (১) যে বীজ হইতে সন্তানের উৎপত্তি সেই বীজে পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কলা বা অবয়ব (Factors) প্রচ্ছন্ন থাকে। (২) ঐ কলার সংস্থান যদৃচ্ছাক্রমে নির্দ্ধারিত হয়। (৩) বিরুদ্ধ-লক্ষণাক্রান্ত কলাদ্বয় মিলিত হইয়াও স্বতন্ত্র-ভাবে থাকে—একটি প্রবল আর একটি দুর্ব্বল হয়। (৪) এক পুরুষে যে কলা দুর্ব্বলভাবে অব্যক্ত থাকে পুরুষান্তরে তাহাই আবার প্রবল হইয়া ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

ডার্বিনের মতে একই আপেল কালে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া হাজার হাজার বিভিন্নভাবে বিবর্ত্তিত হইল। মেণ্ডল-মণ্ডলীর মতে এই বিচিত্র বিভিন্ন আপেলের ভিন্ন ভিন্ন কলা সেই বীজরূপী আদি আপেলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিত ছিল, কালসহকারে অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া

(Eq. $\frac{(D)}{(D)} \times \frac{(R)}{(R)} = (D) + 2(D)(R) + (R)$

Formular অর্থ—

D = Dominant property
R = Recessive property
D + 2DR + R এখানে
D = 25 % pure dominant
2DR = 50 % alternately
R = 25 % pure recessive.

তাহারা বিভিন্নরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইল। এখন আর বোধ হয় বাইবেলের প্রাণিসৃষ্টি-ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিকগণ এত সহজে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন না। নোয়ার নৌকায় বাস্তবিকই হয়তো সমস্ত জীবজন্তুর এক-এক জোড়া করিয়া বীজ রক্ষিত হইয়াছিল। পুরাণের মৎস্যাবতারেও আমরা এইজাতীয় বিবরণই দেখিতে পাই। গীতার 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি যে অসম্ভব, এই তত্ত্বই যেন আস্তে আস্তে বৈজ্ঞানিক-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বসিয়াছে।

বেট্‌স্‌ম্যান বলেন "বিকাশের বা বিবর্ত্তনের সমস্ত সম্ভাবনাই অনাদিকাল হইতে জীব-বীজাণুতে বর্ত্তমান থাকে, বিবর্ত্তনের ফলে এই সকল অব্যক্ত সম্ভাবনাগুলি আস্তে আস্তে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহাকে আমরা মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়র-রূপে পাইয়াছি, তিনিও একদিন আলপিন হইতে ক্ষুদ্রতর এক জীবপঙ্কের মধ্যে পূর্ব্বাবধি প্রচ্ছন্ন ছিলেন।"*

বেট্‌স্‌ম্যান আরও বলেন "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মানুষের কলাবিদ্যা বাহির হইতে আগত একটা কিছু নহে। সাধারণ মানুষে যে কলাশক্তি নিরুদ্ধভাবে রহিয়াছে, প্রতিভাশালীর মধ্যে তাহা অবাধিত গতি লাভ করিয়া

* "Factors of all possibilities in evolution fore-exists. Shakespeare once existed as a speck of protoplasm, not so big as a small pin's head".—Batesman.

ঐ ভাবে স্ফুরণপ্রাপ্ত হয়। যেখানে আমরা কোনও উচ্চবৃত্তির বিকাশ দেখি, সেখানে উহা যে বাস্তবিক পক্ষে বাধাবিমুক্তির অর্গল-নিবৃত্তির স্বাভাবিক ফল—কোনও আগন্তুক পূর্ত্তিবিশেষ নহে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। যেমন বাদ্যযন্ত্র পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, এখন তাহাতে সুরসংযোগ হইল মাত্র।" *

বেট্‌স্‌ম্যানের এই উক্তিগুলি দেখিয়া পতঞ্জলির "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনামাবরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" সূত্রের কথাই কেবল মনে হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাধন পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন আদি প্রকৃতির পরিণামসাধন বিষয়ে প্রয়োজক নহে, ইহারা শুধু আবরণটি মাত্র দূর করিয়া দেয়। ক্ষেতের আইল কাটিয়া দিলে জল আপন ধর্ম্মানুসারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, আবরণ দূর হইলে প্রকৃতিও আপন পরিণামসাধনে আপন উদ্দেশ্যপূরণে নিজেই সক্ষম হন। শারীরিক ব্যাধি দূর

* "I have confidence that the artistic gifts of mankind will prove to be due not to something added to the make up of an ordinary man, but to the absence of factors which in the normal person inhibit the developments of these gifts. They are almost beyond doubt to be looked upon as releases of powers normally suppressed. The instrument is there but it is stooped down."—Prof. Bateaman's 'Presidential Address' at the British Association in 1914.

হইলে জীব পূর্ণ পরিণতিলাভের সুযোগ পায়। 'নিত্য সিদ্ধ 'কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়, অনর্থ নিবৃত্তি হলে প্রেমের উদয়'। সর্ব্বত্র একই ভাবের খেলা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিবর্ত্তনের (evolution) প্রকৃত অর্থই যে ক্রমাভিব্যক্তি (growth from within), যাহা ভিতরে অব্যক্তভাবে বীজভাবে লুক্কাইত ছিল তাহাই বাহিরে ব্যক্তভাবে প্রকাশ পাওয়া। সমস্ত শক্তি সমস্ত সম্ভাবনা আমাদেরই অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল, সুযোগ পাইয়া তাহা আজ ফুটিয়া বাহির হইল। † মানবের উন্নতির শ্রীবৃদ্ধির প্রস্রবণ জটিল অফুরন্ত, আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করি। ‡ পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিকিৎসকের ন্যায় সাহায্য করিতে পারে বাধা দূর করিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারে না। §

ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) যে দেহের নয়, প্রাণের আত্মার—ইহা প্রমাণিত হইয়া গেলে পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব স্বাভাবিক

* E = out, and volvo = to roll. বাহিরে বিকশিত হওয়া, খুলিয়া প্রকাশ পাওয়া।

† All powers and capacities must lie latent within, pre-existing awaiting the right conditions for their expression.

‡ Evolution is a growth from within, an unfolding of potentialities, which are inexhaustible and to which we can put no limit.

§ এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "পুনর্জন্ম" এবং স্বামী যোগানন্দ সরস্বতীর "জীবতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে। এই প্রাণ আত্মা স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন, স্থূল দেহের ভিতর দিয়া প্রাণশক্তি আস্তে আস্তে আপন স্বরূপ প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। দেহের নাশে প্রাণ নষ্ট হয় না, তখন সে যে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া বিকাশ পাইতে চেষ্টা করে। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব এবং দেহাবলম্বনে আত্মার প্রকাশ পূর্ণ পরিণতিলাভের চেষ্টা দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে বাধ্য হই যে, পুনর্জন্মতত্ত্ব বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিরোধী নহে; অন্ততঃ বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্র জোর করিয়া তাহাকে অস্বীকার করিতে সমর্থ নহে। পৃথিবী পূর্ব্বে ছিল তেজঃপুঞ্জ-বিশেষ, ক্রমে তাহার উষ্ণতা কমিয়া গিয়া আজ এই অবস্থায় আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে অত তেজের মধ্যে তাঁহাদের বর্ণিত জীবের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব; সুতরাং জীব পৃথিবীর স্থূল ভূত হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ বলেন, হয় তো অন্যান্য গ্রহ হইতে পৃথিবীতে জীব আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু সেই গ্রহে প্রথমে কোথা হইতে জীব আসিল, তাহারও তো একটা মীমাংসা আবশ্যক? ইহাঁরাও তো এমন কোনও প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই, যাহা বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে বাধ্য। আমাদের বক্তব্য এই যে, জীব তেজোলোকে বাস করিতে পারে না একথা কে বলিল? স্থূলদেহ লইয়া আমাদের মত বাস করিতে না পারিলেও সূক্ষ্মদেহে স্বরূপে

তাহার বাস অসম্ভব বলার অধিকার বিজ্ঞান কোথায় পাইলেন? স্থূলদর্শী বিজ্ঞান জীবের যে স্থূল লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সূক্ষ্মদর্শী ঋষি-সাধকগণ জীবত্বকে তাহাতে সীমাবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আত্মা জীব অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য। স্থূল তেজ আত্মার সূক্ষ্মভাবে অবস্থানকে বাধা দিতে পারে না। জীবের পক্ষে সূক্ষ্মদেহ লইয়া তেজ-তত্ত্বের মধ্যে বাস করা কোন মতেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। ঋষিদের মতে আত্মা স্থূল-দেহসম্ভূত নহে, সূক্ষ্ম-স্থূল-দেহাবলম্বনে বিকাশপ্রাপ্ত লীলাতৎপর। তাই তো গীতাদি-শাস্ত্র স্থূল দেহকে আত্মার বস্ত্ররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবশ্যক-বোধে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও ঠিক তেমনি পুরাতন অকর্ম্মণ্য দেহ ত্যাগ করিয়া আবশ্যক-বোধে নূতন দেহ গ্রহণ করে। যে পর্য্যন্ত পূর্ণ বিকাশ পূর্ণ পরিণতি লাভ না হয়, যে পর্য্যন্ত যাবতীয় কাল্পনিক অধ্যাসের পূর্ণ নিবৃত্তি না ঘটে, সে পর্য্যন্ত আত্মা বার বার উপযুক্ত দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা স্থূল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব পুনর্জন্ম-রহস্য প্রমাণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিলাম না, তবে ইহা যে অবৈজ্ঞানিক নহে বরং বিজ্ঞানসম্মত হইবারই যোগ্য, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হিন্দুমতে জীব ব্রহ্মেরই অংশ; তাঁহার অনন্ত শক্তি বিভূতি, তাঁহার সমস্ত জ্ঞান ও আনন্দের উত্তরাধিকারী। প্রতি জীবে বীজরূপে ব্রহ্মশক্তি নিহিত আছে, সাধনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইলেই আমাদের ভিতর দিয়া সেই শক্তি অবাধিত-ভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া আমাদের জীবন সার্থক করিতে পারে। জীবের শক্তি আগন্তুক নহে, জীবের অন্তরেই অবস্থিত; ইহা ভগবদ্দত্ত। সমস্ত শক্তি বিভূতি পূর্ণতার সম্ভাবনা প্রতি সন্তান-বীজে নিহিত আছে। জীব অন্নময়-কোষ ভেদ করিয়া স্থাবর অবস্থা ত্যাগ করিয়া প্রাণময়-কোষে জঙ্গমরাজ্যে উদ্ভিদ্-তত্ত্বে উপনীত হয়। তাহার পরে মনোময়-কোষের বিকাশে ক্রমে সরীসৃপ মৎস্য পক্ষী পশু-দেহের ভিতর দিয়া গিয়া বিজ্ঞানময়-কোষে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। মনুষ্যজন্মের মধ্যেও সভ্য অর্দ্ধসভ্য পূর্ণ সভ্য প্রভৃতি অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রমে আনন্দময়-কোষে গিয়া দেবত্বের অধিকারী হয়। ইহার পরে কোষাতীত গুণাতীত বিদেহ অবস্থা লাভ করিয়া কৈবল্য-পদ প্রাপ্ত হয়। স্থাবর হইতে এই মুক্তাবস্থায় যাইবার জন্য হিন্দুমতে চৌরাশি লক্ষ যোনির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং জন্মান্তর-তত্ত্বের মধ্য দিয়াই জীবের পূর্ণত্বলাভের কৈবল্য-প্রাপ্তির ভগবৎদর্শনের রাস্তা প্রসারিত রহিয়াছে। মানুষ এই জন্মান্তরের ধাপগুলি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বশেষে আপন

গম্যস্থানে সেই চির-প্রার্থিত ভগবৎধামে গিয়া পূর্ণসিদ্ধি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া জীবন জন্ম ও ভগবৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করে। বড়ই সুখের কথা যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রও আস্তে আস্তে আমাদের ধর্ম্মমন্দিরের নীচের সিঁড়িগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাদের ভগবৎমহিমা ভগবৎধাম-মহিমা ভগবৎবিধান-মহিমা সাধনমহিমা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভগবান যখন সচ্চিদানন্দ, বেদ বা বিজ্ঞান যখন চিদ্‌বিভূতি, তখন বিজ্ঞান যে তাঁহাকে তাঁহার মহিমাকে প্রচার করিবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। যেখানে বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ করিবে, সেখানেই বুঝিতে হইবে—হয় বিজ্ঞান বুঝিতে ভুল করিয়াছে, না হয় তো ধর্ম্মশাস্ত্রে আবর্জ্জনা জমিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকে আচ্ছাদিত বিকৃত মলিনীকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে, যখন বিজ্ঞান ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞান বলিয়া গৃহীত পূজিত ও প্রচারিত হইবে। অনেকের বিশ্বাস পুনর্জন্মবাদ অবৈজ্ঞানিক ও অন্ধ-বিশ্বাসীর জন্য ; এবিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভুল পুনর্জন্মবাদও যে সর্ব্বধর্ম্মসম্মত বিজ্ঞানসম্মত সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতদের অনুমোদিত, তাহা দেখাইবার জন্যই এতগুলি অবান্তর কথা লিখিতে হইল।

দর্শনে পুনর্জন্ম

……প্রাচীন বিখ্যাত গ্রীকপণ্ডিতগণ যে কারণেই হউক পুনর্জন্ম মানিতেন। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ তাহার সাক্ষী। অনেকের বিশ্বাস ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহারা অতি আগ্রহের সহিত বেদাদি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্লেটো ও পিথাগোরাস্ বলেন "পাপীদের আত্মা নিম্নশ্রেণীর জন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করে।" * অন্যত্র প্লেটো বলিয়া গিয়াছেন "যে সব আত্মা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান

পাশ্চাত্য-দর্শন

* "The souls of the wicked pass into the bodies of animals"

লাভ করিতে অসমর্থ, দেহান্তে তাহারা মনুষ্য-দেহ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।"* পাশ্চাত্য কবি গেটে (Goethe) পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমি এখন যেমন আছি এইভাবে সহস্রবার ছিলাম—ভবিষ্যতে আরও সহস্র বার এই ভাবে আসিব।" †

পোলিশ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক লুটোস্লস্কি (Lutoslawski) জড়বাদ পরিত্যাগ করিয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জন্মান্তর-গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। তিনি বলেন "এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে, এজন্মের পূর্ব্বে আমি ছিলাম; এবং ইহার পরে আমি আবার মনুষ্যজীবনের পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বে অনেকবার পুরুষ ও স্ত্রী-রূপে ধনী ও নির্ধন-রূপে বদ্ধ ও মুক্ত-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যজীবনের সব তথ্য অবগত

* "For the soul which has never perceived the truth can not pass into the human form."

† "I am sure that I, such as you see me here, have lived a thousand times and I hope to come again another thousand times"—*Goethe* said this at Weilam's funeral. Jan 25, 1813.

হইয়া নরজন্ম সার্থক করিব, তাহাতে আমার বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।" * বর্ত্তমান যুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হাক্সলি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কি বলেন তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন, "চঞ্চলমতি অবিবেচক ব্যতীত অপর কেহই বোধ হয় জন্মান্তরবাদকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন না। বিবর্ত্তনবাদের ন্যায় জন্মান্তরবাদও যে সত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিচার-যুক্তি দ্বারা সমর্থিত।"

ইংলণ্ডের রোমের জার্ম্মাণির বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতগণ পুনর্জন্মবাদকে একদিন সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণির সোপেনহার লেসিঙ্গ হেগেল লিব্‌নিটস্‌ প্রভৃতি

* "I cannot give up my conviction of a previous existence on earth before my birth, and that I have the certainity to be born again after my death, until I have assimilated all human experience, having been many times male and female, wealthy and poor, free and enslaved, generally having experienced all conditions of human condition."

† "Like the doctrine of evolution itself that of transmigration has its roots in the world of reality, and it may claim such support as the great argument of analogy is capable of supplying."—Huxley's Evolution of Ethics.

এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিউম প্রভৃতিও এই মতকে একটী যুক্তিপূর্ণ মতবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সাধকদিগের মধ্যে ডাক্তার ক্রুক সার ওলিভার লজ প্রভৃতি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে যে ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন ও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমেরিকান ও জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে ভাবে পুনর্জন্মবাদকে বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে এই রহস্যটিকে শুধু একটা অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে গিয়া প্রকৃত সত্যনির্দ্ধারণে অসমর্থ হওয়া বোধ হয় কোনও বুদ্ধিমানের পক্ষেই শোভনীয় নহে। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা যে একটা অত্যাবশ্যকীয় কাজ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রাচীন হিন্দুগণ আগম-শাস্ত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেন যে ভ্রমাত্মক তাহা বুঝাইবার জন্য 'সাংখ্যকারিকা' "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ সৌক্ষ্মাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। (১) সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহগণ অতিদূরে অবস্থিত বলিয়া সুবৃহৎকায় হওয়া সত্ত্বেও এত ক্ষুদ্র-রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকার সম্বন্ধে চক্ষুজনিত প্রত্যক্ষ এখানে অতি দূরত্ব নিবন্ধন আমাদিগকে সত্যাবধারণে

প্রাচ্য-দর্শন

বাধা দেয়। (২) দৃশ্যপদার্থ নিকটবর্ত্তী হইলেও আমরা প্রত্যক্ষে বাধা পাইয়া থাকি,চক্ষুস্থ অঞ্জন অতিসামীপ্য হেতু দৃষ্টি গোচর হয় না। (৩) ইন্দ্রিয়ের ব্যাধি আমাদিগকে বস্তুর স্বরূপ অবধারণে বাধা দিয়া থাকে, কামলা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সাদা ও সবুজ পদার্থকে হরিদ্রাভরূপে দর্শন করিয়া থাকে। (৪) মন চঞ্চল বা বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে সেই অন্য-মনস্কাবস্থায় আমরা সত্যনির্দ্ধারণে সক্ষম হই না। এক ইন্দ্রিয় যখন কার্য্য করিতে থাকে, তখন অপর ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে বাধা জন্মিয়া থাকে। (৫) দৃশ্য পদার্থের সূক্ষ্ম স্বরূপ আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হয় না, আমরা বায়ু কিংবা বায়ুস্থ কীটাদি দেখিতে পাই না। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি স্থূল বিষয়-গ্রহণে সমর্থ, যাহা সূক্ষ্ম স্থূল-ইন্দ্রিয় তাহা কি করিয়া গ্রহণ করিবে? সাধনা দ্বারা ভগবৎকৃপায় ঋষি-মুনিগণ সূক্ষ্ম-পদার্থদর্শনে সূক্ষ্ম-তত্ত্বাবধারণে যোগ্যতা লাভ করেন। (৬) দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে দেওয়াল প্রভৃতি ব্যবধান থাকিলে দৃশ্য পদার্থ অনুভবে পাই না। (৭) অনেক সময় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দ্রব্যবিশেষের শক্তিতে অভিভূত থাকায় দ্রব্যান্তর-দর্শনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। সূর্য্যালোক দ্বারা অভিভূত থাকায় দিবাভাগে নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। (৭) সমানাভিহার হেতুও আমরা প্রত্যক্ষে বাধা পাই। ছাত্রগণ-পরিবেষ্টিত পুত্রের অধ্যয়ন-শব্দ অনেক

সময় চিনিতে পারা যায় না। এই সব কারণে প্রত্যক্ষে ভুল হওয়া ভুল থাকা স্বাভাবিক। অনুমান প্রত্যক্ষমূলক, সুতরাং সেখানে ভুল না থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এইজন্য সাধনা দ্বারা যাহার চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গুলি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ও শক্তিমান হইয়া পড়িয়াছে, যাহার চিত্তে কোনও কামনা বাসনা আসক্তি স্বার্থপরতা ও প্রতিষ্ঠার মোহ স্থান পায় না, সেই সব স্বরূপপ্রতিষ্ঠ আত্মদর্শী সর্ব্বভূত-হিতে রত ঋষিমুনিগণের অনুভূত তত্ত্বগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তার পরে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে তাঁহাদের উপদেশ মত চলিয়া সেই সব তত্ত্বগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করাই সুবিবেচনার কার্য্য। প্রেত-ভাব ও পুনর্জন্ম-তত্ত্ব সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত স্থূল ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে প্রথমতঃ আগম-শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাহার পরে সে তত্ত্বগুলিকে আমাদের বোধগম্য করিবার জন্য যে সব দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যে সে সব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রায় সকলদেশীয় আগমশাস্ত্রই যে পুনর্জন্ম-তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে; এখন এ বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র কি বলেন তাহা লইয়া একটু বিচার করা যাউক।

হিন্দু চিরকালই একটা আধ্যাত্মিক জাতি। তাহার

দৃষ্টি ভিতরের দিকে, প্রকৃতির ত্রিবিধ-দেহের সব স্তর-গুলি ভেদ করিয়া অন্তরতম আত্মা পরমাত্মা পর্য্যন্ত না গিয়া সে থামিবার পাত্র নহে। বহুর দেশ হইতে রওয়ানা হইয়া সে সেই একের দেশে একের কাছে গিয়া পৌঁছিল, ডালপালা ফলফুলের বিচিত্রতার নিকট হইতে রওয়ানা হইয়া গিয়া সেই মূলের কাছে গোড়ার কাছে একের কাছে উপস্থিত হইল; তাই একের বহুত্ব বহুর একত্ব, সগুণের নির্গুণত্ব নির্গুণের সগুণত্ব, সাকারের নিরাকার ও নিরাকারের সাকার ভাব, ব্যক্তের অব্যক্তভাব এবং অব্যক্তের ব্যক্তভাব তাহাকে আর কোনও বাধা দিতে সমর্থ হইল না। অজর অমর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা আপন মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য কি ভাবে জন্মমৃত্যু-লীলার মধ্য দিয়া আপন মৃত্যুঞ্জয়-রূপ ফুটাইয়া বাহির করিলেন, সে সব তত্ত্ব তাহার নিকট ধরা পড়িল। মৃত্যুঞ্জয় উপাসক সাধনবলে ভগবৎকৃপায় মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইল। ব্যষ্টি-সমষ্টি-ভাবের জন্মমৃত্যু-তত্ত্ব খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয়-রহস্য সাধারণ মৃত্যু ও নির্ব্বাণ-তত্ত্বের পূর্ণ রহস্য তাহার নিকট অবাধিত-ভাবে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল। জন্মমৃত্যু তাহার নিকটে কতকটা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-তত্ত্বের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে বসিল। মৃত্যুটা যেন মার কোলে শিশুর ঘুমাইয়া

পড়ার ন্যায়, জাগরণটা যেন মার কোল হইতে সখাদের সহিত গোচারণে যাওয়ার মত মনে হইল। সাধকগণ পূর্ব্ব-গোষ্ঠ ও উত্তর-গোষ্ঠলীলার মধ্য দিয়া জন্মমৃত্যু-তত্ত্ব আস্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিদ্রার ভিতর দিয়া আমাদের যেমন দেহাদির ক্ষতিপূরণ পুষ্টিসাধন ও বলবিধান-কার্য্য সাধিত হয়, মৃত্যুর ভিতর দিয়াও আমরা তেমনি উন্নততর শ্রেষ্ঠতর জীবনলাভের সুযোগ লাভ করি। পরলোক-গমন সাধকদের নিকটে কতকটা যেন বদলী (transfer) হওয়ার মত মনে হয়। ফকির ফিকির-চাঁদ মৃত্যুকে কি ভাবে দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অমর সঙ্গীতে প্রকাশ পায় "আজ চললো ফিকির বাজিয়ে বীণা আস্তানায়, ও তার সাধন-ভজন হলো নাকো আমার আমার এই মায়ায়"। সাধক বলেন সন্ধ্যাটা অন্ধকারটা দর্শনশক্তি-রোধটা যেন মায়ের কাছে যাবার ঘণ্টা বা নিশান (signal)। মরণের ভিতর দিয়া মার বুকে ঢলিয়া পড়িয়া বিশ্রাম-লাভকে বরণীয় করিয়া তোলার জন্যই যেন অজ্ঞান-কুয়াসায় কিছু সময়ের জন্য আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মার বুকে আনন্দসমাধির মাঝে সব দৃশ্য সব জগৎ সব স্মৃতি লয় পাওয়াই যে স্বাভাবিক। আমি তো ঘুমটাকে বড়ই ভালবাসি। নিশ্চিন্তভাবে মার কোলে ঢলিয়া পড়িয়া পরম আনন্দে লীন হইয়া যাইতে কে না ভালবাসে? এই

ছোট ঘুমের দৈনিক ঘুমের আনন্দের ভিতর দিয়া মা যেন আমাদিগকে সেই মহাঘুমের সাংসারিক মৃত্যুতত্ত্বের পরম মরণের পরম নির্ব্বাণের পর্য্যন্ত একটা আভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। মহানিদ্রার পূর্ব্বে আমাদিগকে যেমন অনেকবার জাগিতে ও ঘুমাইতে হয়, ঠিক যেন সেইরূপ পরম নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বেও আমাদিগকে অনেকবার জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়।······

প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ভিতর-বাহিরের বেশ একটা সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী ঋষিমুনিগণ যেন বাহিরের দিকটা একটু তুচ্ছ করিয়া চলিলেন ভিতরের দিকে; ফলে আস্তে আস্তে আবিষ্কার করিয়া বসিলেন দেহতত্ত্ব—ত্রিবিধ-দেহ ও পঞ্চকোষ-রহস্য। দিব্য চোখে দেখিতে আরম্ভ করিলেন ইহাদের প্রকৃত রহস্য অদ্ভুত লীলাতত্ত্ব। আবিষ্কার করিয়া বসিলেন স্থূলদেহ কিভাবে জন্মমৃত্যুকে ভজনা করে কিরূপ বিনাশশীল; এবং সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময়-কোষ কিভাবে জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া আপন সত্তা বজায় রাখিয়া আস্তে আস্তে পরিণতির ভিতর দিয়া সর্ব্বশেষে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া আত্মবিকাশের জীবের কৈবল্যলাভের সহায় হয়, অবিদ্যা মায়াময় কারণশরীর আনন্দময়-কোষ কি ভাবে আত্মতত্ত্বে আপন স্বরূপে লয়প্রাপ্ত হয়। দেখিয়া লইলেন আত্মার

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ, শান্ত শিব সুন্দর রূপ। আবিষ্কার করিয়া বসিলেন কর্ম্মের ভিতর দিয়া জীব কৈবল্য-মুক্তি-লাভের পূর্ব্বে লিঙ্গদেহ সহ কি ভাবে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুকে ভজনা করে। জগতের সমস্ত বৈষম্যের জন্য জীবের আপন আপন কর্ম্মফল অদৃষ্ট কামনা বাসনা ভাবনাই যে পূর্ণরূপে দায়ী, ভগবানের যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই, তাহাও তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবৎমহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে পাশ্চাত্য জাতি ছুটিলেন বাহিরের দিকে কার্য্যের ভিতর দিয়া ; তাই মূল কারণতত্ত্বের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল না, বাহিরের যাবতীয় বৈষম্য তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কেহ দুঃখী কেহ সুখী, কেহ দরিদ্র কেহ ধনী, কেহ জন্মাবধি পীড়িত ব্যাধিগ্রস্ত কেহ বা আজীবন সুস্থদেহে আরামে অবস্থিত। কাহারও পাপপ্রবৃত্তি মজ্জাগত, কেহ বা চিরদিন সর্ব্বভূত-হিতে রত ; কেহ অজ্ঞানী কেহ জ্ঞানী,—জগতে কেন এত বিরোধ, ভগবানের রাজ্যে কেন এত বৈষম্য ? আনন্দময়ের দেশে এত নিরানন্দের সম্ভাবনা কোথা হইতে আসিল ? যাঁহারা বিশ্বাসী খ্রীষ্টভক্ত তাঁহারা মহা সমস্যায় পড়িলেন। যাঁহারা জড়বাদী নাস্তিক তাঁহারা আকস্মিক সংঘাত, প্রকৃতির খামখেয়ালি প্রভৃতির দোহাই দিয়া নিস্তার পাইতে সচেষ্ট হইলেন। ক্যাণ্ট নিউম্যান প্রভৃতি দার্শনিকেরা

পরলোকে একটা সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। প্রকৃত উত্তর পাশ্চাত্য জগতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যে উপায়েই হউক কর্ম্মফল-তত্ত্ব অবগত হইয়া পুনর্জন্ম-তত্ত্বের সাহায্যে কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনে কে? যাহার কারণ রহিয়াছে ভিতরে, বাহিরে খুঁজিয়া তাহা কোথায় পাইবে? হিন্দুর উপনিষদ্ হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র কর্ম্মতত্ত্বের ভিতর দিয়া গিয়া শক্তিতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া এই সব বৈষম্যের মূল কারণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। উপনিষদ্ বলেন "জীব ভাবনাময়; জীবিতকালে যেরূপ ভাবনা করে, দেহান্তে সেইরূপ গতি লাভ করে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়" (ছা-৩।১৭।১)। যে যাহা চায় সে তাহা পায়, আমাদের কর্ম্মের সংস্কারগুলি দাগগুলি ছাপগুলি আমাদের চিত্তে (Tabula Rasa) অঙ্কিত থাকিয়া যায়। যে ইহজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে পর জন্মে ঠিক সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। বাইবেলের ভাষায়, যে যেরূপ বীজ বপন করে সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। "বিধির এমনি কল, যে যেমন কার্য্য করে তার তেমনি ফল।" পূর্ব্বজন্মে তুমি অপরকে কষ্ট দিয়াছ, তাই ইহজন্মে তুমি এরূপ কষ্টভোগ করিতেছ। পূর্ব্বজন্মে তুমি সকলকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলে, এজন্মে তাই তুমি সকলের

ভালবাসার পাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হিন্দু সাধক ইহজন্মের কার্য্য দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের কার্য্য বুঝিতে এবং আগামী জন্মের গতি নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন। জীব স্বয়ংই তাহার সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী; পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনা সংস্কার আদি তাহার ইহজন্মের সুখদুঃখের মানদণ্ড। ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন, তিনি কর্ম্মের সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন মাত্র। যেমন নাটশালায় আপন শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে একই ব্যক্তি একবার পরশুরাম আর একবার অজাতশত্রু অন্যবার বৎসরাজরূপে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ জীব এই সংসারের রঙ্গমঞ্চে আপন কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া বৃক্ষ পশু মনুষ্য ও দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ঋষি পতঞ্জলি জীবের মরণত্রাস দর্শন করিয়া সেই সংস্কারের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্বজন্ম-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন 'সংস্কারসাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্'। ন্যায়দর্শনকর্ত্তা ঋষি গৌতম সহজাত সংস্কার ও জন্মসিদ্ধ রাগদ্বেষের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া পুনর্জ্জন্মবাদ প্রমাণিত করিয়া ফেলিলেন। সূক্ষ্মশরীরে অঙ্কিত চিত্র যে স্থূলদেহের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহা আবিষ্কৃত হইয়া মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মদেহের স্থিতি দেহান্তর-প্রাপ্তি যুক্তি দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়া পড়িল!......

প্রকৃতি পুরুষেরই, পুরুষেই লীন হইয়া ছিল ; পুরুষ হইতে বাহিরে প্রকট হইল প্রকাশ পাইল সৃষ্ট্যাদি পরিণতি বা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পুরুষের আনন্দপ্রাপ্তির জীবের কৈবল্যলাভের সহায় হইবার জন্য। সূক্ষ্মদেহ মন দেহাত্ম-বুদ্ধি এই লীলার সহায়রূপে সৃষ্ট হইল। 'অহং'কে জাগাইয়া তুলিয়া পরিণত করিয়া আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়া সার্থক করিয়া তোলাই হইল হিন্দুক্রমবিকাশ-তত্ত্বের একটা প্রধান রহস্য। প্রতি জীবে পূর্ণ পরিণতিলাভের সামর্থ্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, এই পূর্ণ পরিণতিলাভের আগে কাহারও বিশ্রাম করিবার অধিকার নাই। কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই পরিণতি লাভ করিতে হইবে, এই সত্তা চৈতন্য ও আনন্দকে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া বাহির করিতে হইবে। এক দেহে এতটা কাজ সম্ভবপর হইতে দেখা যায় না, অনেকখানি কাজ অনেকগুলি কামনা বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। স্থূলদেহ এই ভোগায়তন শরীর, ইহার সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মফল-ভোগ অসম্ভব। সেইজন্য পূর্ণ পরিণতি অর্থাৎ কৈবল্যলাভের পূর্ব্বে জীবকে পুনঃ পুনঃ স্থূল-শরীরধারণ জন্মগ্রহণ করিতে হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরে দেহান্তর-গ্রহণ করার কথা দূরে থাকুক, জীবিত অবস্থায়ই হিন্দু যোগী সিদ্ধ-মহাত্মাগণ নিজের দেহ ত্যাগ করিয়া অপরের দেহে প্রবেশ করিবার শক্তি লাভ করিতেন। ভগবান পতঞ্জলি পরকায়-প্রবেশশক্তিকে যোগের একটা

বিভূতি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং মৃত অমরক রাজার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজার দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া আপন অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিলেন। সুলভা দেবী স্বদেহ পরিত্যাগ না করিযাও জনক-দেহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিচার করিয়া আবার স্বদেহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ শিবাবতার গোরখনাথের গুরু মৎস্যেন্দ্রিয়নাথ যোগবলে আপন সঞ্চিত কর্ম্ম পূর্ব্বসংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়া এই দেহেই সে সমস্ত কর্ম্মফলের ভোগ পরিসমাপ্ত করিয়া কৈবল্য-মুক্তির অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাশ্চাত্য-দর্শনের গতি যেমন বাহিরের দিকে একটু বেশী, প্রাচ্য-দর্শনের গতি তেমনই ভিতরের দিকে একটু বেশী প্রসারিত; আসল সত্য কিন্তু বাস করে এই ভিতর-বাহিরের পূর্ণ সমন্বয় ও পূর্ণ পরিণতি যেখানে। আমরা আশা করি বিজ্ঞান ও দর্শন যখন আপন আপন মত ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে সচেষ্ট হইবেন, তখনই আমরা জন্মান্তরবাদের গূঢ়-রহস্য পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব।

······যদি জন্মান্তরগ্রহণ-বাদ সম্ভবপর হয়, তবে পূর্ব্ব-জন্মের কথা কিছু মনে থাকে না কেন? পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলে যে এই জন্মে অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু বিকলাঙ্গ ও ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া শারীরিক এবং ধনহীন বিষাদগ্রস্ত ও শোক-সন্তপ্ত হইয়া মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা যদি ভাল করিয়া বুঝিতেই না পারিলাম তবে এই সকল শাস্তিভোগের ভিতর দিয়া আমার শোধন-কার্য্য অভিজ্ঞতা-লাভ সৎপথে প্রবৃত্তিলাভ আর কি করিয়া সাধিত হইতে পারে? এ সব বেশ সুন্দর কথা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সভ্যযুগের লোক-দের নিকটে ভারতের ঋষিমুনিগণ কিন্তু বেশ সুন্দর যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা স্মৃতি ও পুরাণাদি-গ্রন্থের সাহায্যে এতত্ত্ব বেশ সুন্দরভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন্ কারণ হইতে কোন্ কার্য্যের উৎপত্তি, কোন্ পাপের জন্য কিরূপ ফলভোগ হয়, কি কারণে আমরা এত দুঃখকষ্ট পাই, তাহা বেশ সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। ফলিত জ্যোতিষ-গ্রন্থে পূর্ব্বজন্মের কি পাপে কোন্ ব্যাধি দুঃখ কষ্ট শোক উপস্থিত হইয়াছে, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার

শাস্তির সম্ভাবনা আছে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুত-গ্রন্থের শরীরস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে সহজাত ও আগন্তুক ব্যাধির বর্ণনাচ্ছলে সহজাত ব্যাধিকে কেন ভোগনাশ্য বা অসাধ্য বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমরা এতত্ত্বের আভাস পাইয়া থাকি। "অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্" এই শ্লোকাংশ ও তাহার ভাষ্য অনেক সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ। মৃত্যু-যন্ত্রণা মরণ-ভীতি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অত্যাসক্তি আদি কেন কিভাবে জীবের পূর্ব্বস্মৃতি লোপ করিয়া দেয়, শাস্ত্র তাহারও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তারপরে সাধারণ লোকের পক্ষে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লোপ পাওয়া যে কত আবশ্যক তাহাও বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কে আমার শত্রু মিত্র স্বামী বা স্ত্রী ছিল তাহা বুঝিতে পারিলে সাধারণ লোকের পক্ষে যে সংসারযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিনের জন্য সাধুপ্রভাবে দূর-দর্শন ও দূর-শ্রবণ শক্তি লাভ করিয়া জনৈক রাজা যে কি ভাবে উন্মাদপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় তোমার মনে আছে। অধিকারীর ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি যে অনাধিকারীর হাত হইতে দূরে রাখা আবশ্যক, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ধারাল চাকু কি যার-তার হাতে দেওয়া যায়? যে শক্তির সদ্ব্যব-

হার করিতে জানে, প্রকৃতি তাহাকেই শক্তি দান করিতে ব্যস্ত। যে জ্ঞানী যে প্রেমিক যে সর্ব্বভূত-হিতে রত যে নিঃস্বার্থপর, প্রকৃতির খাস্‌মহলের সব দরজা সর্ব্বদা তাহার নিকট উন্মুক্ত; সে সেখানে গিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে সক্ষম হয়। যে-সব তত্ত্ব সাধারণ লোককে জানাইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা অথচ ঐ সব বিষয়ে একটু জ্ঞানলাভ সাধারণের কল্যাণের সহায়, সেখানে মানুষকে জ্ঞানদান করিয়া সাবধান করিয়া দিবার জন্য প্রাচীন ঋষিমুনিগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমরা অহংকার-বশে তাঁহাদের কথা শুনিব না, তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িব না, বিনা বিচারে তাঁহাদের শিক্ষা অলীক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিব, এজন্য তো আর অপরে দায়ী নহে! যাহারা প্রমাণ চায় তাহারা পায়, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তারপরে ব্যাধি-বিশেষে যে কি ভাবে পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পায় বা পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে শক্তিবিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহাও যে একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কাশীতে কোনও যুবতী হিষ্টিরিয়ার ফিটের সময় দূরের জিনিস দেখিবার দূরের কথা শুনিবার শক্তি (পাতঞ্জলের দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ-শক্তি) লাভ করিয়াছিল। বহুদিন উপবাস করার ফলেও সময় সময় পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পায়। বর্ত্তমান জন্মে এই দেহেই যখন নানা কারণে অনেক স্মৃতি লোপ পায়, তখন পুনর্জ্জন্মের স্মৃতি

লোপ পাওয়া অন্ততঃ সংস্কারবদ্ধ সংস্কারে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

শাস্ত্র বলেন তিনটি বলবান প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি লোপ করাইয়া দেয়। (১ম) লব্ধ অনুভূতি—আমরা সর্ব্বদা কতকগুলি অনাবশ্যক দ্রব্যের চিন্তায় স্মৃতির ভারে এমন অস্বাভাবিক-ভাবে ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ি যে, তাহাদের ভাবনা ছাড়া আর অন্য ভাবনা আমাদের মনে স্থান পায় না, অন্য সংস্কার আমাদের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ পায় না ; ফলে অনেকগুলি স্মৃতি অনুশীলনের অভাবে চাপা পড়িয়া যায়। (২য়) কালের দীর্ঘতা—অনভ্যাসের ফলে অনেকদিন পরে আমরা অনেক আবশ্যকীয় কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। বর্ত্তমান লইয়া আমরা এত ব্যস্ত যে সুদূর অতীতের বা ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবসর প্রায়ই পাওয়া যায় না। (৩য়) উপলক্ষ্য বা স্মারকের অভাবে এবং বুদ্ধির কালুষ্য হেতু উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে অনেক শক্তি লোপ পায়, অনেক কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। তার পরে চিত্তের মলিনতা ও বিকৃতি পূর্ব্বপূর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা অঙ্কিত চিত্তের রেখাপাতগুলিকে সুন্দরভাবে দেখিতে বুঝিতে বাধা দিয়া থাকে। বাজে রেখার প্রাবল্য কাজের রেখাগুলিকে অদৃশ্য ও অস্পষ্ট করিয়া তোলে।

যাঁহারা সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া

চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিতে অভ্যাস করেন, তাঁহাদের চিত্ত হইতে সমস্ত অন্তরায় ও বাধা-বিঘ্ন দূর হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা চিত্তবৃত্তি দর্শন করিতে চিত্তরেখাগুলি পাঠ করিতে পূর্ব্বপূর্ব্ব সংস্কারগুলি সাক্ষাৎকার করিতে এবং নিজের ও অপর সকলের জন্মান্তর-তত্ত্বগুলি দেখিতে বুঝিতে বুঝাইতে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। পূর্ণ আদর্শ ভগবৎ-অবতার শ্রীকৃষ্ণ সংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়া বহুজন্মের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে, "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥" 'হে অর্জ্জুন, তোমার ও আমার বহুজন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে—সে সকল আমি জানি, তুমি জান না।' গর্ভস্থ ঋষি বামদেবের মুখ দিয়া বৈদিক ঋষিগণ পূর্ব্বজন্মলব্ধ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধ কোন্ জন্মে কি ছিলেন কি করিতেন, তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। "তিব্বতে তিন বৎসর" (Three Yeares in Tibet) নামক গ্রন্থে তান্ত্রিক বাঙ্গালী যুবক অতীশের ১১০০ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়া ধর্ম্মপ্রচারের কথা লিখিত আছে। এই অতীশেরই জনৈক প্রশিষ্য গেণ্ডুন টব (Geudun Tub) তাঁহার মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন "আমি অমুক স্থানে অমুকের পুত্ররূপে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিব"। পরে জানা গেল ঠিক সেই স্থানে সেই ব্যক্তির পুত্ররূপে একটি

বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বালক কথা কহিতে শিখিলেই বলিল 'আমাকে আমার মন্দিরে (monastry) টাসি লেম্বুতে লইয়া চল'। সেখানেই নাকি গেণ্ডুন টবের মৃত্যু হইয়াছিল। গেণ্ডুন টবের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বালককে গুরুজ্ঞানে ভক্তি করিত। জাতিস্মর জাতি অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের কথা জগতের সর্ব্বত্রই পরিচিত। কেহ জন্ম হইতেই জাতিস্মর, কেহ বা সাধনা দ্বারা সংস্কার-সাক্ষাৎকরণান্তর জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। জাতিস্মর সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন, পূর্ব্ব-দেহে ভাবিত শাস্ত্র চিত্তভূমিতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া মানুষকে জাতিস্মর অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তজ্ঞ করিয়া তোলে :—

"ভাবিতাঃ পূর্ব্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ঃ।
ভবন্তি সত্ত্বভূয়িষ্ঠাঃ পূর্ব্বজাতিস্মরা নরাঃ॥"

স্ত্রস্থানীয় ২য় অনুবাক্

"সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" (পাতঞ্জল ৩।১৮)। যোগিগণ নিজের ও অপরের সংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়া নিজের ও অপরের পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের বিবরণ অবগত হইয়া থাকেন। আজকালও সময় সময় এমন যোগী মহাপুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাঁহারা অনেক জন্মের বিবরণ বলিয়া দিতে সমর্থ। শুনিতে পাওয়া যায় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার গুরুদেবের কৃপায় পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন,

পূর্ব্বজন্মের অনেক ঘটনা দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্রও প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে প্রাণীদের স্নায়ু বা পেশীতে ও উদ্ভিদ-দেহে, এমন কি প্রস্তর-খণ্ডে পর্য্যন্ত সংস্কারের রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়; উপায়-বিশেষ দ্বারা ঐ সংস্কারগুলি জাগাইয়া তুলিয়া প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব নহে। আমরা এমন সাধু দেখিয়াছি যিনি কোনও পাথর দেখিয়া বা প্রাচীন গাছ দেখিয়া বলিতে পারেন, সেখানে কোন্ সময় কোন্ মহাত্মা কি ভাবে সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনের ছন্দগুলি কম্পনগুলি সংস্কারগুলি ঐ সকল বৃক্ষ-প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সাধকগণের নিকট গ্রামোফোণের সঙ্গীতের ন্যায় সে সব তত্ত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সকলের নিকটই বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তবে সাধকবিশেষে সে সঙ্গীত শুনিতে বুঝিতে সুদক্ষ। আকাশ-তত্ত্বে লিখিত চিত্র-গুপ্তের খাতা কি যে-সে পড়িতে বা বুঝিতে সমর্থ হয়? স্থূল পদার্থ দেখিবার জন্য স্থূল ইন্দ্রিয় যথেষ্ট, কিন্তু সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শনের জন্য সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এই দিব্য দর্শন ও সাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্তে ভগবৎকৃপার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অলৌকিক তত্ত্বোপলব্ধির জন্য অলৌকিক বোধ-শক্তি আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই যে কাহাকেও দেখিবামাত্র পরম আত্মীয় বা শত্রু বলিয়া একটা দৃঢ় ধারণা জন্মে, ইহার মূলেও ভারতের ঋষিমুনিগণ পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ জনিত

একটা সংস্কার দেখিতে পান। দুষ্মন্তের মত শুদ্ধ-শান্তচিত্তে শকুন্তলা-দর্শন জনিত একটা প্রেমাঙ্কুর দেখিতে পাইয়া 'মনো হি জন্মান্তর-সঙ্গতিজ্ঞম্' মন যে জন্মান্তর-সঙ্গতি অনুভবে সক্ষম, কাশ্যপ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। আমরা যাহাকে স্বভাব (Instinct) প্রতিভা বা অদ্ভুত মানুষ (Prodigy) বলিয়া, না বুঝিয়াও বুঝি বলিয়া আপন আপন অজ্ঞতাকে ঢাকা দিয়া চাপা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করি বা চেষ্টা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি, জ্ঞানিগণ তাহার মধ্যেও প্রাক্তন জন্ম-বিদ্যার একটা সংস্কারবিশেষের ছায়া দেখিয়া থাকেন। কবি কালিদাসের 'প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্ম-বিদ্যাঃ' এই সহজ বাক্যটির মধ্যে আমরা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-দের অদৃষ্ট অননুভূত বিজ্ঞান-দর্শনের পরিচয় পাইয়া থাকি।

বসন্তকালে কোকিল যেমন আপনা হইতে ডাকিতে আরম্ভ করে, বর্ষাকালে রাজহংস যেমন আপনা হইতে মানস-সরোবরের দিকে ধাবিত হয়, চন্দ্র উদয়ে কুমুদী যেমন আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে; সেইরূপ উপযুক্ত সময় আসিলে প্রাক্তন-জন্মবিদ্যা পূর্ব্বজন্মলব্ধ সংস্কারগুলি আপনা হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। কালিদাসের কবিত্বশক্তি হঠাৎ ফুটিয়া বাহির হইবার কথা ভারতবাসীর নিকট অতিশয় পরিচিত তথ্য। রোমের প্রসিদ্ধ বীর জুলিয়াস সিজার নাকি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেরাণীগিরি করিয়া

জীবন কাটাইয়া ছিলেন, একদিনের জন্যও অসিধারণ করেন নাই; রোমের গৃহবিবাদের ফলে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের যুদ্ধ-বিদ্যা হঠাৎ ফুটিয়া বাহির হইল। দরিদ্র অশিক্ষিত কবি বার্ণসএর ভিতরেও কবিত্ব-শক্তি অকস্মাৎ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া জগৎ মোহিত করিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় বলা হইয়া থাকে যে 'Genius is born, not made' প্রতিভা জন্মগত, শিক্ষাগত নহে। অতি শৈশবেই কোন কোন বালকবালিকা কিছুমাত্র শিক্ষা না পাইয়া যে ভাবে সুন্দর সুন্দর কালোয়াতী গান করিয়া কঠিন কঠিন গৎ বাজাইয়া শ্রোতাগণকে মোহিত করিয়া দেয়, তাহা দেখিয়া শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। আমি ছাত্রাবস্থায় একটি বালককে দেখিয়াছিলাম, যে কোনরূপ অঙ্কপাত না করিয়া পঁচিশ-সংখ্যক অঙ্ককে পঁচিশ-সংখ্যক অঙ্ক দিয়া মনে মনে গুণ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে গুণফল বলিয়া দিতে সক্ষম হইত। অন্যত্র একটি সাত বৎসরের বালক দেখিয়াছিলাম, যাহার দর্শনশাস্ত্রের জ্যোতিষশাস্ত্রের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিভা দেখিয়া অবাক্ হইতে হইয়াছিল। পাস্কালের গণিতশাস্ত্রের প্রতিভা, শঙ্করের বেদ ও দর্শন-শাস্ত্রের সংস্কার, বামদেবের ও কপিলের শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহাদের অপরিণত বয়সেই বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া সাধক-পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। আজকাল সুসভ্য আমেরিকা জার্ম্মাণী ফ্রান্স

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন বালক-বালিকাদের আশ্চর্য্য প্রতিভা-শক্তি দেখিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিমোহিত হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা স্বভাব (Instiuct) হইতে বা উত্তরাধিকার-সূত্রে এই প্রতিভা লাভ করিয়াছে, একথা বলিলে এখন আর চলিবে না। বিশ্বকর্ম্মার সেক্‌সপীয়রের নেপোলিয়নের বিদ্যাসাগরের পুত্রগণ যে তাহাদের পিতাদের নিকট হইতে পৈতৃক বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা বলা চলে না। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম, শাক্যকুলে বুদ্ধের জন্ম, সূত্রধরের কুলে যীশুর জন্ম লোকসমাজে সুপরিচিত। বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন "পিতঃ! আমি তো শাক্য-রাজবংশে জন্মি নাই, অতি প্রাচীন যে বোধিসত্ত্ববংশ—আমি সেই বংশে জন্ম ধারণ করিয়াছি"। এইভাবে প্রহ্লাদকে বিষ্ণুভক্ত-বংশে, যীশুকে খ্রীষ্টবংশে, চৈতন্যদেবকে প্রেমিকবংশে, শঙ্করকে ব্রহ্মজ্ঞ-বংশে জাত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস হোমার বাইরন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আদির কবিত্বশক্তি, তানসেন বিটোভেন লিণ্ডগ্রীন আদির সঙ্গীতবিদ্যা, ময়দানব মাইকেল এঞ্জেলো ফরিয়াদ আদির ভাস্কর্য্য, একলব্য জুলিয়াস সীজার শিবাজি রাণাপ্রতাপ নেপোলিয়ান আদির যুদ্ধবিদ্যা, যাজ্ঞবল্ক্য কপিল বুদ্ধ সক্রেটিস্ প্লেটো শঙ্কর আদির দার্শনিক প্রতিভা, বুদ্ধের মৈত্রীভাব

যীশুর ভ্রাতৃভাব মহম্মদের জীয়ন্ত ভগবৎবিশ্বাস ও গৌরাঙ্গের প্রেম আদি যে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ শক্তিবিশেষ, একথা বোধ হয় আজকাল কেহই মুখে আনিতে বা কাগজে লিখিতে সাহস করিবেন না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণ এইজাতীয় প্রতিভার কারণ দেখাইতে সক্ষম না হইলেও পুনর্জন্মবাদী ঋষি-বংশধরগণের পক্ষে ইহা একটা বিশেষ কঠিন সমস্যার বিষয় নহে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের মুখে অনেক সময় পূর্ব্বজন্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আর সে সব কথা মনে থাকে না।

কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, মানুষ মৃত্যুকালে আত্মীয়বিশেষের কান্নাকাটিতে মোহিত হইয়া বলিয়া গেলেন 'শীঘ্রই আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব'। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বপ্নে তাহার চারি-পাঁচ জন বন্ধুকে আসিয়া বলিল 'আমি অমুকের পুত্ররূপে অমুক সময় জন্মগ্রহণ করিব'। বলা বাহুল্য, ঠিক সেই সময় সেখানে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল; এবং তাহার আত্মীয়স্বজনের বিশ্বাস হইল যে, সেই ব্যক্তিই আসিয়া সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

যখন ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়ি তখন অজনি ও সজনি নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া বিমোহিত

হইয়া গিয়াছিলাম। ইহাদের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন ঘটনাচক্রে ইহাদেরে পরস্পর দূরে দূরে বাস করিতে হইয়াছিল। .হঠাৎ অজনির কলেরা হইল। মুমূর্ষাবস্থায় প্রলাপের ভিতরে সে বলিতে আরম্ভ করিল "ভাই সজনি, আমরা একসঙ্গে থাকিব একসঙ্গে আবার চলিয়া যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলাম; আমি তো চলিলাম, তুমি এখন কোথায়?" ইহার একটু পরেই সে আবার বলিয়া উঠিল "তুমি এসেছ বেশ হয়েছে, আমিও যাচ্ছি; চল এখন একসঙ্গে যাওয়া যাক।" এই কথা বলিয়া অজনি প্রাণত্যাগ করিল। শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল সজনিও নাকি স্থানান্তরে তখনই হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে যাত্রা করে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়া যায়, পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক-বালিকা নাকি তাহাদের পূর্ব্বজন্মের বাসস্থানে গিয়া আপন সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, পূর্ব্বজন্মের ছেলেমেয়েদের দেখিয়া তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাড়ীর সীমানার ভিতরের দুই-একটি গাছ এবং বাক্সবিশেষের মধ্যে খেলনাবিশেষ বা কাগজবিশেষ দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল। অধুনা বড় বড় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই সব বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের পরে যেরূপ মতামত

প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া এইজাতীয় ঘটনাকে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দিবার আর উপায় নাই। যোগীরা যে দিব্য-দর্শন লাভ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরীয় ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষীভূত করেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বশীকরণপ্রভাবে বালকবিশেষে দিব্য-শক্তির আবির্ভাবের কথাও শুনা যায়। দিব্য-দর্শন যেন বর্ত্তমান সময়ের 'একস্-রে'র মত কাজ করিয়া থাকে। ভগবান পতঞ্জলি "প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্" সূত্রে বলিয়াছেন যোগীগণ সাধনবলে দিব্য-দর্শন লাভ করিয়া স্থূল দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্ম বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থ এবং ব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধানযুক্ত (যেমন বাক্সের অভ্যন্তরস্থ) বস্তুসকল দর্শন করিতে সক্ষম হন। এই তো গেল সাধক জ্ঞানী ও যোগীদের কথা; এখন দেখা যাউক, সাধারণ লোকের ভিতরেও পূর্ব্বজন্মের সংস্কারগুলি দেখিতে পাওয়া যায় কি না?

আমাদের আত্মা অজর অমর জন্মমৃত্যু-রহিত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। আমাদের এই স্থূলদেহ উৎপত্তি-বিনাশশীল জন্ম-মরণধর্ম্মা, ইহা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন এবং মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতে লীন হইয়া যায়। আমাদের ভিতরে যদি শুধু স্থূলদেহ ও আত্মা এই দুইটি মাত্র তত্ত্ব থাকিত, তাহা হইলে পুনর্জ্জন্মের বা পরকালের কোনও কথাই উঠিতে পারিত না; কিন্তু আমাদের এই স্থূলদেহ ও আত্মার মাঝখানে একটি

সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-দেহ এবং আর একটি কারণ-দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেহের মধ্য দিয়া আত্মাকে আত্মধর্ম্মকে ফুটাইয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে সদাই সচেষ্ট। আমাদের এই আত্মা বা মন বিষ্ণুভগবান ত্রিপুরাসুন্দরী বাস করেন আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-রূপী ত্রিপুরের ভিতরে। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা-রূপ মূল অজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বা অনাদি মায়া অপর দেহদ্বয়ের কারণ বলিয়া কারণ-শরীর নামে অভিহিত। ইহারই অপর নাম আনন্দময়-কোষ। বাহিরের স্থূল-শরীরটি অন্নের বিকার, এই অন্নময়-কোষটি সর্ব্বজন-বিদিত তত্ত্ব। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়ব লইয়া আমাদের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ। এই লিঙ্গশরীর প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময়-কোষের সমষ্টিস্বরূপ। আমাদের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাপপুণ্য বন্ধন ও মুক্তির মূল কারণ এই লিঙ্গদেহ বা মন। ইহা অধিষ্ঠান-রূপ সাক্ষিচৈতন্যে সদা অধ্যস্ত,—চৈতন্যের আধ্যাসিক রূপ বলিয়া রজ্জুসর্পবৎ আত্মচৈতন্যে সদাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ইহা যেন চৈতন্যেরই স্বভাব 'দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়ং'। মনরূপ লিঙ্গদেহই আত্মায় বিবর্ত্তিত হইয়া স্থূলদেহাদি-রূপে উৎপন্নবৎ প্রতীত হইয়া থাকে; সুতরাং এই মন বুদ্ধি-অহঙ্কার ও চিত্তরূপে অধ্যস্ত হইয়া স্থূলদেহের উৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান

ছিল। ইহা স্থূলদেহ হইতে পৃথক্‌ভূত স্থূলদেহ দ্বারা অস্পৃষ্ট বলিয়া স্থূলদেহের নাশের পরেও ইহা থাকিয়া যায়। মৃত্যুতে শুধু অন্নময়-কোষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময়-কোষযুক্ত লিঙ্গদেহ বা মন পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান থাক এবং আবশ্যক-বোধে স্বাভাবিক সামর্থ্যানুসারে বার বার স্থূলদেহ গ্রহণ করে। যেমন নট রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া কখনও রামরূপে কখনও বানররূপে কখনও বা রাক্ষসরূপে প্রতীয়মান হয়, মনরূপী লিঙ্গ-দেহও ঠিক সেইরূপ কর্ম্মবিধান মতে বিভিন্নজাতীয় স্থূলদেহ অবলম্বনে, কখনও স্ত্রী কখনও পুরুষ কখনও ব্যাঘ্রাদি কখনও বা দেবতাদিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। মন বা লিঙ্গদেহ যে সব বিভিন্ন জন্ম ধারণ করে, তাহার স্মৃতি সংস্কাররূপে চিত্তভূমিতে অর্থাৎ মনে অঙ্কিত থাকিয়া যায়। পর পর জন্মে উদ্বোধকের সহায়তায় উহার সজাতীয় সংস্কারগুলির আস্তে আস্তে অভিব্যক্তি হইতে দেখা যায়। দেহান্তের পরেও যে মনের অস্তিত্ব থাকিয়া যায়, জন্মান্ধের স্বপ্নদর্শন সেই স্মৃতিরূপ মনের পূর্ব্বাস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বপ্ন জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বিষয়ের সংস্কার হইতে জাত ; 'স্মৃতং স্বপ্নং তদেব তু' জাগ্রদ্‌-দৃষ্ট বিষয়ের স্মৃতিসমষ্টিই স্বপ্ন। জন্মান্ধ ব্যক্তি এজন্মে কিছু দেখে নাই, সুতরাং তাহার ঐজাতীয় সংস্কার আসিল কোথা হইতে? ইহা ছাড়া এ জীবনে কখনও যেখানে যাওয়া

হয় নাই, যে জায়গার কোনও বিবরণ পড়া বা শুনা যায় নাই, স্বপ্নে সেখানকার সমস্ত দৃশ্য দর্শন করা এবং তৎপরে সেখানে গিয়া স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের সঙ্গে জাগ্রদ্‌দৃশ্যের পূর্ণ সাদৃশ্য অবধারণ করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রতি আকর্ষণ অথবা কাহারও লোকবিশেষকে দেখিবামাত্র বাৎসল্য-রসে পরিপ্লুত হওয়ার মধ্যে দার্শনিকগণ মনের মধ্যে পূর্ব্ব-জন্মের অঙ্কিত ছায়াপাত অনুমান করিয়া থাকেন। ন্যায়-দর্শন "স্তন্যাভিলাষাৎ" সদ্যঃপ্রসূত শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তির মধ্যেও পূর্ব্বজন্মের সংস্কার দেখিতে পান। সদ্যোজাত শিশুর হর্ষ-শোক-ভয়াদি দেখিয়াও ন্যায়দর্শনকার পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃতির অনুমান করিয়া বলিয়াছেন 'পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষ-শোক-ভয়সম্প্রতিপত্তেঃ"। বানর জন্মকালে মাতৃগর্ভ হইতে দুই হাত বাহির করিয়াই গাছের ডাল ধরিয়া রাখে। অবশ্যম্ভাবী পতনজনিত মৃত্যু হইতে এইভাবে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সামান্য বানরশিশু কোথা হইতে লাভ করিল? মনুষ্য-শিশুর ভিতরেও পতন হইতে ভয়ের এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা হেতু অস্থিরতার মূলে আমরা পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের ছায়া দেখিতে পাই। সদ্যোজাত হংসশাবক সন্তরণ করিতে অভ্যস্ত থাকে। গণ্ডারশিশু প্রসূত হইবামাত্রই মার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। মার ধারাল জিহ্বা দ্বারা লেহনজনিত রক্ত-পাতের ভয়ই নাকি এই পলায়নের মুখ্য কারণ। এই যে

বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি; এই যে মরণে ভয়—ইহা আসিল কোথা হইতে? এই যে জন্মসিদ্ধ সহজাত সংস্কারগুলি, ইহা তো সাধন বা শিক্ষাজনিত নহে—ইহা যে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, ইহা আসিল কোথা হইতে? হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের মতে জীব রাগযুক্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, মনে অঙ্কিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কারগুলি স্থূল-দেহপাতে নষ্ট হয় না। ন্যায়দর্শন বলেন সদ্যোজাত শিশুর মনটি (Tabula Rasa) রেখাহীন সাদা শ্লেটের মত নহে, তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই অনেক রেখাপাত হইয়া রহিয়াছে। হার্বার্ট পেন্‌সারও একমাসের শিশুর মস্তিষ্কে প্রকৃতিগত বিশেষত্ব অনুমান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইজাতীয় অনেক কাজকে Instinct বা সহজাত সংস্কার নাম দিয়া সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে অদৃষ্টের বোঝাটা বেশী ভারী করিয়া তুলিয়াছেন। এই সহজাত সংস্কারগুলি কোথা হইতে আসিল, তাহা ইহাঁদের নিকট এখনও অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত রহিয়াগিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য এই সহজাত স্বভাবের যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলে বোধ হয় আর এত গোলযোগের কোনও কারণ থাকে না। "জন্মান্তর-কৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমান-জন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ" (গীতাভাষ্য ১৮।৪১) অর্থাৎ তাঁহার মতে জীবের জন্ম-জন্মান্তরীয় সঞ্চিত সংস্কারগুলির যাহা চৈতন্যসহায়ে বর্ত্তমান জন্মে স্বকার্য্যাভি-

মুখে অভিব্যক্ত হয়, তাহারই নাম স্বভাব। এই স্বভাবই প্রকৃতি অবিদ্যা অব্যক্ত বা অহংকার আদি নামে উক্ত হইয়া থাকে। গীতায় 'প্রকৃতিই সব করায়' 'স্বভাবই সব প্রবৃত্তির মূল' ইত্যাদি কথার মধ্যেও আমরা এই ভাবই দেখিতে পাই। আশা করি বুঝিতে পারিয়াছ, প্রকৃতির সব তত্ত্বগুলি কেন সংযত জ্ঞানী যোগীদের নিকট ব্যক্ত এবং সাধারণ লোকের নিকট অব্যক্ত। মা প্রকৃতি-দেবী যে কিছুই গোপন করিতে চান না তাহাও ধ্রুব সত্য, তবে অপাত্রে প্রকাশ করিয়া অনর্থের সৃষ্টি করিতে তিনি অনিচ্ছুক। জ্ঞানীর কাছে সব তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেও সাধারণ লোকে যে কিছুই জানে না, তাহাও বলিতে পার না; তবে বাহিরের অনাবশ্যক দ্রব্যের বোঝায় তাহারা এত ভারাক্রান্ত যে ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিবার তাহাদের সুযোগই জোটে না। "সেটি বনফুল সৌন্দর্য্য অতুল রাখিলেন তৃণ মাঝে। কত লোক যায় নাহি দেখে তায় বিব্রত সংসার কাজে।" আমরা সংসার-কাজে অতিমাত্র বিব্রত, একবারও চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিব না বুঝিতে চেষ্টা করিব না; এজন্যও কি আমাদের মা ভগবতী আদ্যাশক্তি প্রকৃতি-দেবী দায়ী? উদাসীনতার ফলে দেখিবার ভাবিবার সুযোগ জুটে না, অনুশীলনের অভাবে সংস্কারগুলি ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ পায় না; নতুবা যাহাকে আমরা সহজাত বা স্বাভাবিক সংস্কার বলিয়া অগ্রাহ্য

করি, তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে তাহা লইয়া একটু বিচার করিলে সংস্কারগুলির স্বরূপটা একটু বুঝিতে চেষ্টা করিলে পূর্ব্বজন্ম-রহস্য হৃদঙ্গম করা আমাদের পক্ষে এতটা কঠিন হইয়া পড়িত না। "সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানম্" এই সূত্র দ্বারা ভগবান পতঞ্জলি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কি করিয়া পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব সুন্দরভাবে অনুভবে আনা যায়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্র যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আমরা আশা করি, জন্মান্তর-রহস্য পরলোক-তত্ত্ব অচিরে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে পরিণত হইয়া সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইবে।

—১৭।৯।১৯১৩

...মানুষ মরিয়া ক্রমে উন্নত জন্ম লাভ করে অথবা পশু-পক্ষী আদি রূপে নিম্নযোনিও প্রাপ্ত হইতে পারে, একথার উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। আমার নিজের মত জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, শক্তি (force) যেমন সামনে না গেলে পিছনেও যাইতে পারে (If it does not go forward, it must go backword), তেমনি আমরা সৎকর্ম্ম দ্বারা উপরের দিকে যাইতে চেষ্টা না করিলে অসৎকর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিব। তবে আমি ভগবৎকৃপায় প্রকৃতির মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস করি; তাই আমার মনে হয় আমাদের এই পতনের মধ্য দিয়াও মা আনন্দময়ী প্রকৃতি আমাদিগকে উন্নতির দিকে ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করেন। মার কাজই যে ছেলেমেয়েদেরে বুকের কাছে টানিয়া লওয়া, নিজের আনন্দে বিভোর করিয়া রাখা। শাস্তি যে শোধনের জন্য, পতনও যে উত্থানের সহায়, ব্যাধি যে 'অবাধিত

গতিপ্রদানের হেতু, অসুখ যে সুখকে প্রচার করিতে প্রকাশ করিতেই সৃষ্ট, তাহাতো অস্বীকার করা যায় না। প্রাকৃতিক নিয়ম ভগবৎবিধানের অবমাননার ফলে অনেক ভগবৎপার্ষদ পর্য্যন্ত মনুষ্যরূপে অসুররূপে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভগবৎকৃপায় ভগবৎসান্নিধ্যে তাঁহাদের উদ্ধারের কথা পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের 'যমলার্জ্জুন-সংবাদ' ইহার সাক্ষী। আমাদের প্রেমময় শ্রীভবানের জীবের দুঃখে যে হিয়া বিদারিত হইয়া যায়! এসব বিষয়ে আমি আগমাদি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের কথা বেশী বিশ্বাস করি। কথাগুলি ঠিক ঋষিদের কি না তাহা অবশ্য একটু ভাবিয়া দেখি, কিন্তু ঠিক তাঁহাদের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে একবার মানিয়া লইলে তাহাতে আর আমার কোনও সন্দেহ থাকেনা। তাহার পরে সে সম্বন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে, সাধনা দ্বারা তাহার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি। নহুষ রাজার সর্পযোনি-প্রাপ্তি বা ভরতরাজার হরিণরূপে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি অবিশ্বাস করিবার আমি কোনও কারণ খুঁজিয়া পাই না। এখন দেখা যাউক, এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র কি বলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই "যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী

পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি। পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি। যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে। যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।” অর্থাৎ 'যাহার যেমন কার্য্য যেমন আচরণ, সে সেইরূপ হয়। সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় হয়, পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপসঞ্চয় হয়। জীবকে কামময় বলা হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ কামনা, তাহার সেইরূপ ভাবনা হয়। যাহার যেরূপ ভাবনা, সে সেইরূপ কর্ম্ম করে; যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহার সেইরূপ গতি হয়।' অন্যত্র দেখিতে পাই—“যাহার মন যেখানে আসক্ত, সে কর্ম্ম দ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হয়।” ছান্দোগ্যে (৫।১০।৭) দেখিতে পাই “যাহারা রমণীয় কর্ম্ম করে, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-যোনি লাভ করে; আর যাহারা কুকর্ম্ম করে, তাহারা অশুভ-যোনিতে কুকুর শূকর চণ্ডালাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে।” কঠোপনিষদে (২।২।৭) দেখিতে পাই “কোন কোন জীব শরীর ধারণ করিবার জন্য মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, কেহ বা স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত হয়।” মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।১০) দেখিতে পাই “যেসব মূঢ় কর্ম্ম-কাণ্ডকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহারা স্বর্গলোকে পুণ্যভোগ করতঃ ইহলোকে বা ইহা অপেক্ষা আরও হীনতর লোকে ফিরিয়া আইসে।” মনু বলেন (১২।৯) “মানুষ শারীরিক

দুষ্কর্ম্মের ফলে স্থাবর, বাচিক দুষ্কর্ম্মের ফলে পশু-পক্ষী এবং মানসিক দুষ্কৃতির ফলে অন্ত্যজাতির যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।” পাপকর্ম্মের ফলে মানুষ যে পশুজন্ম লাভ করে, তাহা আমরা গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত প্লেটোর উক্তিতেও দেখিতে পাই।

এখানে বলিতে পার যে মানুষ পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদি জন্ম লাভ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া কিভাবে পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ হয়? প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ বৃক্ষ-লতা ও ওষধি-তৃণাঙ্কুরকে পর্য্যন্ত জীব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাদেরও চৈতন্য আছে মন আছে বোধশক্তি আছে, তাহারাও দর্শন শ্রবণ আদি সব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মহাভারতের ‘ভৃগু-ভরদ্বাজসংবাদে’ (শান্তিপর্ব্ব ১৮৪অ) এ বিষয়ে অতি সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহার একটু অতি সামান্য আভাস দেওয়া হইল।... “উত্তাপে বৃক্ষের বর্ণ ত্বক্ ফল পুষ্প ম্লান হয়, শুকাইয়া যায়; অতএব তাহাদের স্পর্শবোধ আছে। বায়ু অগ্নি ও বজ্র-নির্ঘোষে ফল-পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া যায়, অতএব পাদপ শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ শুনিয়া থাকে। পাদপ দেখিতে পায়; কারণ তাহার ডাল-পালা লতা আদি যথাপ্রয়োজন বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে—যেখানে হাওয়া ও আলোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সেই দিকে প্রসারিত হয়। গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা গাছের রোগ

দূর হয়, ফুল-ফলে সুশোভিত হয়; অতএব গাছের প্রাণশক্তি আছে। বৃক্ষ শিকড় দ্বারা আহারসংগ্রহ করে, জলপান করে, পাতার সাহায্যে হাওয়া খায়···গাছেরও সুখ-দুঃখবোধ আছে, এজন্য আমি গাছের ভিতরে জীবত্ব দর্শন করিয়া থাকি।" আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোধ হয় এসব বর্ণনা পাঠ করিলে সুখী হইবেন। তিনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সাহায্যে যে সব তত্ত্ব প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, প্রাচীন ঋষিগণ সাধনাবলে যোগনেত্রে প্রেমের প্রভাবে সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে বৃক্ষাদির মধ্যে মনোময়-কোষের বিকাশ দেখিতে পাওয়া না গেলেও, তাহারা যে কর্ম্ম দ্বারা উচ্চযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে না, পূর্ব্ব দুষ্কৃতির ফল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না, একথা আমরা স্বীকার করিনা। শাস্ত্র যে মনুষ্যের পক্ষে কুকর্ম্ম দ্বারা নিম্নযোনি লাভ করা সম্ভবপর মনে করেন, তাহা দেখা গেল; এখন এবিষয়ে অনুমান যুক্তি ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র কি বলেন, তাহা একটু দেখা যাউক।

সৃষ্টি বা জন্ম আত্মাকে প্রকাশ করিবার জন্য আত্মানন্দ আস্বাদ করিবার ও করাইবার জন্য। যে উদ্দেশ্যে যে কাজ আরম্ভ করা হয়, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে সে কাজের একান্ত নাশ কৌশলের পরিচায়ক নহে। সৃষ্টিকার্য্যের সর্ব্বত্র কৌশল ও বিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখ্য-

দর্শনও বলেন, আত্মার স্বরূপপ্রতিষ্ঠার জন্য কৈবল্যানন্দ-লাভের সহায় হওয়ার জন্য প্রকৃতির এই সৃষ্ট্যাদি-লীলার অবতারণা। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ ও আনন্দময় হইলেও মনের চঞ্চলতা চিত্তের ময়লা তাহাকে স্বরূপ অনুভব করিতে দেয় না। ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া মন স্থির করিয়া মনকে লয় করিয়া চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া আত্মাকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ও স্বয়ংপ্রকাশ-ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। এসব কাজ শুভ-কর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধন-সাপেক্ষ। অশুভ কাজ ইহাতে বাধা দেয়। জীব সেজন্য শুভকার্য্য দ্বারা আত্মোন্নতির আত্মবিকাশের আত্মানন্দানুভূতির সহায় হয়; এবং অশুভ কাজ দ্বারা আত্মার অবনতির দুঃখ-কষ্টানুভূতির কারণ হয়। শুভকাজ দ্বারা জীব উন্নত-যোনি এবং অশুভ কাজ দ্বারা নিম্ন-যোনি প্রাপ্ত হয়। মানুষ কতটা শুভ কতটা বা অশুভ কাজ করিতে পারে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা যখন কঠিন, তখন জীবের উচ্চগতি ও নিম্নগতির সীমানির্দ্দেশ করিতে যাওয়াও তত সঙ্গত নহে; সুতরাং মানুষ যে মনুষ্যেতর নিম্ন-যোনি প্রাপ্ত হইতে পারে না, একথা ঠিক নহে। তবে এই নিম্নগতি-লাভের মধ্যেও কল্যাণময়ী প্রকৃতি-দেবী ভগবৎবিধান তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার উন্নত গতিলাভের সহায় হইতে সর্ব্বদা তৎপর। সাধক সর্ব্বত্র ভগবৎকৃপার নিদর্শন দেখিতে পাইয়া মোহিত হইয়া যান।

······দেহান্তে জীবের চন্দ্রলোকে ও সূর্য্যলোকে গমন কৃষ্ণ-শুক্লমার্গে প্রস্থানতত্ত্বের মধ্যে উপহাস করিবার কোনও কারণ আমিতো দেখিতে পাই না। কোনও তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাহার স্বরূপ অবধারণ না করিয়া উপহাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। আমাদের এই দেহের মধ্যেই 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' আদি সপ্তলোক অবস্থিত আছে। যোগ-শাস্ত্রের মতে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত সাতটি চক্র সাতটি কেন্দ্র, এই সাত-লোক সাত-তত্ত্ব উপ-লব্ধির স্থান। মনোময়-কোষ বা সূক্ষ্মদেহ চন্দ্রলোক এবং কূটস্থ সূর্য্যলোক। মৃত্যুর পরে আমরা প্রাণময়-কোষে গিয়া প্রেতলোকে বাস করি, তাহার পরে মনোময় আদি কোষে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করি। যাহারা সূক্ষ্মদেহ ভেদ করিয়া কূটস্থ-তত্ত্বে পৌঁছিতে অক্ষম, সেই সব চন্দ্রলোকবাসী স্বর্গীয় সুখভোগের ক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। আগমন করিবার সময় তাহাদের প্রথমতঃ ভুবর্লোকে প্রাণময়-কোষে তাহার পরে অন্নময়-কোষে ক্রমিক নিম্নতর তত্ত্বে অবতরণ করিতে হয়। অন্নের ভিতর দিয়া নিম্নে আগমন পিতৃদেহে প্রবেশ আদির ভিতরে সূক্ষ্মশরীরের ক্রমে স্থূল-

ভাবাপন্ন হওয়ার রহস্যই বর্ণিত হইয়াছে। নতুবা সূক্ষ্ম-দেহের স্থূলে আগমনের সময় স্থূল বাহনের ততটা আবশ্যক হয় কিনা সন্দেহ। অন্ন ও অন্নদ-তত্ত্বের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে না পারায় অনেক অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে যে-তত্ত্বে অবস্থিত তাহার নীচের তত্ত্বই যে তাহার সম্বন্ধে অন্ন, সে কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। অন্নে আগমন অন্নে অন্নময়-কোষে স্থূলদেহে পরিণতি-লাভের অর্থই যে উপরের তত্ত্ব হইতে স্বর্গ হইতে ক্রমে মর্ত্তে আগমন, সে কথা মনে রাখিতে হইবে। জীব জাগ্রদবস্থায় অন্নময়-কোষ লইয়া ভূলোকে (Physical plane), স্বপ্নাবস্থায় প্রাণময়-কোষ লইয়া ভুবর্লোকে (astral plane) এবং সুষুপ্তি অবস্থায় মনোময়-কোষ লইয়া স্বর্লোকে (mental plane) অর্থাৎ স্বর্গে বিচরণ করে। এই স্বর্লোকই উপনিষদে সোমলোক বা চন্দ্রলোক নামে বর্ণিত। সাধারণ জীব এখান হইতেই ভোগক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্তলোকে ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা সাধারণ জ্ঞানী যোগী বা ভক্ত, তাঁহারা বিজ্ঞানময়-কোষে মহঃ জনঃ ও তপোলোক পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম ; আর যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী আদর্শ যোগী বা পরাভক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা সত্যলোকে ব্রহ্মলোকে বিহার করিবার অধিকার লাভ করেন। ব্রহ্মলোকের অপর নাম নির্ব্বাণলোক, ইহাকে স্থানবিশেষে হিরণ্ময়-কোষরূপেও

উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যাঁহারা মনোময়-কোষ পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আইসেন, তাঁহাদের গতিকে কৃষ্ণা গতি পিতৃযান দক্ষিণাপথ আদি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাঁরা যোগমার্গে সাধনমার্গে যেখান হইতে উত্তরায়ণ-মার্গ আরম্ভ হয়, সেখান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই। ইহাঁ-দের পুনরাবৃত্তি পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। ইহার উর্দ্ধে রহিয়াছে শুক্লা গতি দেবযান বা উত্তরায়ণ-মার্গ, যেখানে পৌঁছিলে জীব ক্রমমুক্তির ভিতর দিয়া এমন এক স্তরে সত্যলোকে গিয়া পৌঁছিতে পারেন যে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার সম্বন্ধেই গীতা বলিয়াছেন 'যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে' যেখানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ইহাই নাকি ব্রহ্ম-ধাম! ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা এ বিষয়ে বেশ সুন্দর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। "যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধারূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অর্চ্চি প্রাপ্ত হন। অর্চ্চি হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয় মাস, উত্তরায়ণ ছয় মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন। সেখানে এক অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-লোকে লইয়া যান।" মহম্মদকে কিভাবে কখন্ এক অমানব দূত আসিয়া আল্লার সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা

ভাবিয়া দেখা উচিত। বাদরায়ণ নিজে বলিয়া গিয়াছেন অর্চ্চি দিবা শুক্লপক্ষ উত্তরায়ণ ও সম্বৎসর আদি মার্গ চিহ্ন বা ভোগ-ভূমি নহে, ইহাঁরা পথপ্রদর্শক দিব্য পুরুষ বা স্বর্গীয় দূতবিশেষ। আপন আপন অধিকার অনুযায়ী ইহাঁরা সাধকগণকে এক-একটী পর্ব্ব (Stages) পার করিয়া দিয়া থাকেন। গীতায় এবং গীতাভাষ্যে শ্রীধর বলেন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও কল্পান্তে পুনরাবর্ত্তনের কথা শুনা যায়; কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" গীতার এই স্মৃতি এবং "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" উপনিষদের এই শ্রুতি ভগবৎপ্রাপ্তের পুনরাবৃত্তি-রোধের কথা প্রমাণিত করিয়া দেয়। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল, কত দূর অবধি পুনর্জ্জন্মলাভ সম্ভবপর এবং কোথায় উহার সম্ভাবনা লোপ পাইয়া যায়।

সিদ্ধান্ত

......ভারতবাসী যে পর্য্যন্ত বিদেশীদের প্রভাবের মধ্যে আসিয়া ভারতীয় ভাব আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে নাই, ততদিন পুনর্জ্জন্মবাদ ভারতে অভ্রান্ত সত্য স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইত। ভারতে

সন্দেহবাদ নাস্তিক্যবাদ ছিল না, একথা আমরা বলি না ; তবে তাহার প্রভাব অতি সীমাবদ্ধ ছিল। যখনই কেহ ঐ বাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিতেন, তখনই প্রাচীন ঋষিমুনিগণ যুক্তি ও অনুভূতির সাহায্যে তাহা খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিতেন। আজকাল আমাদের দেশে এক দলের লোক আছেন, যাঁহারা প্রাচীন যাহা-কিছু তাহার সবই মানেন। ইহাঁদের অনেকে মুখে মানেন, কিন্তু তাঁহাদের এই মানাটা বিশ্বাসটা কাজের ভিতর দিয়া জীয়ন্ত করিয়া তুলিতে বিচারের দ্বারা প্রমাণিত করিয়া দিতে তাঁহারা ইচ্ছুক বা সক্ষম নহেন। যাঁহারা সাধক তাঁহারা এ সব গোল-মালের মধ্যে থাকিতে বা যাইতে ইচ্ছুক নহেন। আর এক দলের লোক আছেন, তাঁহারা না জানিয়া না বুঝিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই তাঁহাদের পাশ্চাত্য গুরুর মত অনুসরণ করিয়া এ সব অস্বীকার করিতে বসেন। কেহ কেহ বা প্রাচ্য অসভ্য জাতির ভিতরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব মনে করেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের গতি কতদূর, সে কোন্ কোন্ তত্ত্ব কি ভাবে কতদূর পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে, এ সব না জানিয়াই যাঁহারা সব সত্যগুলিকে অস্বীকার করিতে বসেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে যাওয়ায় বিশেষ লাভ দৃষ্ট হয় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বেদের শ্রুতিগুলি যে সত্য প্রকাশ করে, বিজ্ঞান-শাস্ত্র আস্তে আস্তে

সেগুলি প্রমাণ করিতে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইবেন। এজন্য আমরা পুনর্জন্ম-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিবার কালে সর্ব্বপ্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রায় সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে পুনর্জন্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ এতত্ত্ব সর্ব্বদেশের সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মত। ইহার পরে শুধু আগম-শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রও আস্তে আস্তে পুনর্জন্ম-তত্ত্ব প্রমাণ করিতে পুনর্জন্ম-রহস্য প্রচার করিতে পুনর্জন্ম-তত্ত্বের সাহায্যে বহুবিধ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং পুনর্জন্মের বিরুদ্ধ মতগুলি অধুনা কিভাবে অসত্য ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে বসিয়াছে। তার পরে দেখান হইয়াছে শুধু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ নহেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতেরাও পুনর্জন্মবাদের কেহ কেহ পরিপোষণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাকে বিশেষভাবে আলোচ্য ও সম্ভবপর তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে উভয় দেশের দার্শনিক মতগুলি যে জন্মান্তরবাদের অনুকূল, পাশ্চাত্য দর্শন যে এই তত্ত্বকে গ্রহণ না করিয়া অনেকগুলি গূঢ় সমস্যার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অক্ষম, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার পরে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার কিভাবে এ জন্মে ফুটিয়া উঠে অনুমিত হয়, অনেকগুলি সত্য ঘটনা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহার

একটা আভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার পরে দেখান হইয়াছে মানুষের পক্ষে নিম্নগতি-লাভ অসম্ভব নহে, তবে তাহার মধ্যেও ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য সুন্দর-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সর্ব্বশেষে দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে কতদূর পর্য্যন্ত পুনর্জন্মের সম্ভাবনা আছে, কোন্ অবস্থায় পুনর্জন্মের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কৈবল্য বা নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ করা যায়। আমরা কাহাকেও পুনর্জন্মতত্ত্বে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিনা এবং আমাদের প্রমাণকেও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিনা, তবে যে বিষয় লইয়া সব দেশের পণ্ডিতগণ উন্নত সাধকগণ যোগী ঋষি তপস্বিগণ এতটা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-শাস্ত্র জোর করিয়া কোনও কথা বলিতে সাহসী হন নাই, যাহার সম্বন্ধে বহু অনুকূল জনশ্রুতি অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা অনেকগুলি জটিল প্রশ্ন অতি সহজে মীমাংসিত হইতে পারে, এমন একটা বিষয়কে না জানিয়া না ভাবিয়া শুধু পরের কথায় অজ্ঞানের প্রভাবে মূর্খতার স্বভাবে গায়ের জোরে অস্বীকার না করিয়া, ইহার মধ্যে বাস্তবিক কোনও তত্ত্ব কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বোধ হয় সকল দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। আমাদের মন এই তত্ত্বাবধারণে একটু আকৃষ্ট হইলে আমরা সুখী হইব।

—চিঠি—

হে আবি, হে স্বপ্রকাশ! আমাদের মোহজাল অজ্ঞানতার কুয়াসা সংস্কারের আবরণ দূর করিয়া আমাদের নিকট তোমার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে জন্মান্তর-তত্ত্ব সত্য কিনা তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া আমাদের যাবতীয় সংশয় দূর করিয়া দাও।

পুরাণে পুনর্জন্ম

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জোর করিয়া কাহাকেও এতত্ত্বে বিশ্বাস করাইতে চাই না; তবে কেহ যদি বিজ্ঞান দর্শন বা সাধনের সাহায্যে এ তত্ত্বের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নিঃসন্দেহভাবে মানুষকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহা দ্বারা জগতের যে প্রচুর কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আমরা চাই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের দৃষ্টি একটু এদিকে আকর্ষণ করিতে; যাঁহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া সমস্ত সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই; কিন্তু যাঁহারা যুক্তি ব্যতীত শাস্ত্র মানিতে অনিচ্ছুক, যাঁহারা বিজ্ঞান না জানিয়াও

বিজ্ঞানের অনুমোদন না পাইলে অন্ততঃ এসব বিষয়ে এক পাও চলিতে চান না, সেই সব লোকের সংখ্যাই যে জগতে বেশী; আর তাঁহাদের সংখ্যাই যখন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তখন তাঁহাদের জন্য এ তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় মনে হয়। মানুষ ভালর জন্য হউক আর মন্দের জন্যই হউক, আত্মীয়স্বজনকে মায়ার পুতুলি স্বরূপ জানিয়াও তাহাদের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মৃত্যুতে সে কি ভাবে অধীর হইয়া পড়ে, শোকে দুঃখে আপন জীবনকে অসার মনে করিয়া সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা পূর্ব্বক আপন জীবনকে দুঃখময় ভারগ্রস্ত করিয়া আত্মীয়স্বজনকে অস্থির করিয়া তোলে, তাহা আমাদের প্রত্যেকের অনুভূত সত্য। মানুষ কেন মরে, মরিয়া কোথায় যায়, কোথা হইতে আসে, মরার পরে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে কি না, থাকিলেই বা আবার দেখা হইতে পারে কি না, দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, কি ভাবে কি করিলে দেখা হইতে পারে, এসব কথা মানুষের চিত্তকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়া থাকে। তাহারা যদি জানিতে পারে তাহাদের প্রেমাস্পদ দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই, তিনি সূক্ষ্ম দেহে অন্য শরীরে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন,' ঋষিগণ

এই কথার সাক্ষী ; এবং তাহারাও সাধনা দ্বারা সূক্ষ্ম-দর্শন লাভ করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে চিনিতে পারিবে পরম আপনা জন বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে, তবে তাহাদের মন যে কতকটা শান্তি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে চলিয়া যাইতেছে সেও মনে কতকটা সান্ত্বনা পাইবে, কারণ তাহার এ যাওয়া একান্তভাবে যাওয়া নহে—সামান্ত একটা পোষাক পরিবর্ত্তন মাত্র। সে এই রুগ্ন শুষ্ক তাপিত ভারাক্রান্ত দেহ ত্যাগ করিতেছে এক হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ কার্য্যক্ষম দেহ লাভ করিয়া কল্যাণের পথে আনন্দের পথে অগ্রসর হইবার জন্যই। তাহার এই ত্যাগ গ্রহণের জন্য, তাহার এই বিরহ মিলনের জন্য। ত্যাগ যদি এইভাবে গ্রহণকে সার্থক না করিত, বিরহ যদি এইভাবে মিলনকে মধুর না করিত, তাহা হইলে প্রেমিক যে তাহার প্রেমাস্পদের বিরহে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া যাইত! আশা শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, শান্তির অস্পষ্ট আলো প্রদর্শন করিয়া উৎসাহিত করে, অন্ততঃ একটা ক্ষণিক আনন্দ দান করে। নাস্তিকের নিকট যে মৃত্যু সর্ব্বনাশ, আস্তিকের নিকট সে মৃত্যু একটা অবস্থান্তর মাত্র, একটা কাপড় বদ্‌লান ছাড়া আর কিছুই নহে। সংসারে কেহই মরিতে চায় না। আমার অস্তিত্ব থাকিয়া যাইবে, আমি আবার আসিব; এ কথা বুঝিতে পারিলে মৃত্যুভয় যে অনেকটা

কমিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। পুনর্জন্মে বিশ্বাস মানুষকে সৎকাজে প্রবৃত্তি দান করে, উৎসাহিত করে এবং অসৎ কাজ হইতে নিবৃত্ত করে; অন্ততঃ ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের আশা মানুষকে জীবের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে, শরীর মন ও বাক্য দ্বারা কাহারও মনে যাহাতে আঘাত না লাগে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলে; কারণ এজন্মে যেরূপ কাজ করিব পরজন্মে তদনুরূপ ফলভোগ করিব। মা যদি জানিতে পারেন ছেলে কোথায় গেল আবার কোথায় আসিল; তাহা হইলে তাঁহার কষ্টের বোঝা অনেকটা লাঘব হইয়া পড়ে। হে প্রেমিক! তুমি নিশ্চয় জানিও শুধু তোমার প্রেম অমর নহে, তোমার প্রেমাস্পদও অমর—প্রেমিক হইতে প্রেমাস্পদকে চিরদিনের জন্য কাড়িয়া লইবে এমন ক্ষমতা কাহারও নাই। পরলোক পুনর্জন্মবাদ যে আর্য্যধর্ম্মের একটা স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব; ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না, এমন কি বিচার করিবারও প্রয়োজন হয় না। যে পরলোকে বিশ্বাসহীন সেই যে নাস্তিক। "পরলোকোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিক-স্তৎবিপরীতো নাস্তিকঃ" (কৈয়ট)। আমি দেখিতে পাই না বলিয়াই যে এসব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। পুনর্জন্মতত্ত্ব তোমার আমার নিকট অজ্ঞাত হইলেও সকলের নিকটই ইহা অজ্ঞাত নহে। আবার

অজ্ঞাত হইলেই যে তাহা অজ্ঞেয় হইবে, এমন কোনও কথা নাই। জানিতে চেষ্টা কর বুঝিবার জন্য সাধন কর; সৎস্বরূপ শ্রীভগবান তোমার সহায় হইবেন। অজ্ঞাত বিষয়ে প্রমাণ শাস্ত্র "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্"; আর অজ্ঞাত বিষয়ে প্রমাণ হইবে তোমার সাধন জনিত অনুভূতি। কোনও মতে তোমার ভিতরকার সংস্কারগুলি সাক্ষাৎকার কর, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান কর, তোমার পূর্ব্বজাতি পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে সব জ্ঞান আপনা হইতে ফুটিয়া বাহির হইবে। ভগবান পতঞ্জলি কেন যে খুব জোর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানম্" সে তত্ত্ব তুমি বুঝিতে পারিবে। সমস্ত সংস্কার সাক্ষাৎকার না হইলে কার্য্য-কারণতত্ত্ব ধরিতে না পারিলে এজন্ম ও পূর্ব্বজন্মের ভিতরকার সম্বন্ধটা অবগত হওয়া যায় না। যাহা সূক্ষ্মতত্ত্ব তাহা দেখিবার জন্য সূক্ষ্ম-দর্শন দিব্যদৃষ্টি আবশ্যক। সাধন-রাজ্যে অনুভূতির দেশে দিব্য-দর্শনবিহীন লোক অন্ধের তুল্য। যে অন্ধ তাহার উচিত চক্ষুষ্মানের কথামত চলা। মহাভারতকার আত্মজ্ঞান-বিরহিত দিব্য-চক্ষুবিহীন ব্যক্তিকে অন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

যথান্ধকারে খদ্যোতং লীয়মানং ততস্ততঃ।
চক্ষুষ্মন্তঃ প্রপশ্যন্তি তথাচ জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

পশ্যন্ত্যেবংবিধং সিদ্ধা জীবং দিব্যেন চক্ষুষা।
চ্যবন্তং জায়মানঞ্চ যোনিং চানু প্রবেশিতম্॥

যেমন নেত্রযুক্ত পুরুষ অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে বিচরণশীল বা লুক্কায়িত জোনাকি পোকাগুলি দেখিতে পায়, সেইরূপ জ্ঞানচক্ষু-বিশিষ্ট সিদ্ধ মহাত্মাগণও দিব্য চক্ষু দ্বারা জীবের পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য যোনির সাহায্যে শরীরান্তরে প্রবেশ-রূপ জন্মান্তর-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। গীতায়ও ঠিক যেন ইহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়,—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

জীবকে দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সূক্ষ্মদেহে অবস্থিতির সময় আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিসকল দেখিতে পান, কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি সেখানে কিছুই দেখিতে পায় না। "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥" হে অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, আমি সে সব জানি কিন্তু তুমি তাহার কিছুই অবগত নও। জ্ঞানীর নিকট যে তত্ত্ব উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়, অজ্ঞানী সে তত্ত্বের কিছুই দেখিতে পায় না। যে যাহা জানে না সে আর তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

সৃষ্টি ও লয়তত্ত্ব জন্মমৃত্যু-রহস্য একভাবে সাধিত, একভাবেই সাধক সিদ্ধ-জীব দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। কর্ম্ম ইচ্ছাশক্তি বা স্পন্দনই সৃষ্টির মূল; এই কর্ম্ম যজ্ঞ বা সৃষ্টিস্থিতি, ইহারা আপন আপন উদ্দেশ্য সফল না করিয়া পূর্ণ পরিণতিলাভ সার্থকতালাভ না করিয়া কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। মাঝখানে বিশ্রামলাভ অসম্ভব। এটা যে জগৎ, চলিতে থাকাই যে ইহার স্বভাব। মহা-প্রলয় (absolute equilibrium) খণ্ডপ্রলয় (relative equilibrium) উভয়ই সত্য—সেই গুণাতীত উদাসীন শান্তাবস্থায় না গিয়া ব্যষ্টি-সমষ্টির মধ্যে কাহারও যে নিবৃত্তি নাই। এই পূর্ণ পরিণতি-লাভ একজন্ম-সাধ্য নহে, তাইতো কর্ম্মতত্ত্ব স্পন্দনতত্ত্ব যজ্ঞতত্ত্ব পরিণতি-বিবরণ-তত্ত্ব-জ্ঞ ঋষিগণ পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য। তার পরে যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাস করেন, শ্রীভগবানকে জ্ঞান-ময় দয়াময় প্রেমময় বলিয়া জীবনের প্রতিপদক্ষেপে প্রতি-চিন্তায় ধ্যান-সমাধিতে অনুভব করিয়া তাঁহাকে 'গতির্ভর্ত্তা সুহৃৎ সাক্ষী' পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মা বলিয়া অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা আর কি করিয়া বিশ্বাস করিবেন যে, তাঁহাদের শ্রীভগবান জীবহৃদয়ে বাসনা দিয়া-ছেন অথচ তাহার তৃপ্তির ব্যবস্থা করেন নাই, প্রেম দিয়া-ছেন অথচ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের পূর্ণভাবে প্রেমানন্দ-

লাভের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই! প্রেমস্বরূপের ন্যায় তাঁহারই ব্যষ্টি-বিভূতিস্বরূপ প্রেমিক প্রেমাস্পদ ও প্রেমকেও যে তিনি নিত্যতত্ত্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চায়, কেহই মরিয়া যাইতে লোপ পাইতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত নহে, ইহা দেখিয়া ভগবৎভক্ত সাধক প্রেমিকগণ আর কি করিয়া পরলোক-তত্ত্ব জন্মান্তর-তত্ত্ব অস্বীকার করিতে পারেন? শাস্ত্র জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ-তত্ত্ব বন্ধন-মুক্তিরহস্য ত্রিচিত্রগ্রন্থিভেদ আদি যে ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যে-সব তত্ত্বানুভূতির জন্য যে-সব সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও যে আমাদিগকে কর্ম্মবাদ জন্মান্তর-তত্ত্বে বিশ্বাস করিতে উৎসাহিত করে। হিন্দুধর্ম্ম হইতে হিন্দুর দর্শনাদি-শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ-মহাত্মাদের অনুভূতির বর্ণনাগুলি হইতে পুনর্জন্মতত্ত্ব বাদ দিলে কি যে অবশিষ্ট থাকে, কি ভাবে যে সে সকল সাধন অনুভূত ও সম্পাদিত হইতে পারে তাহা বলা কঠিন। এই জন্যই বোধ হয় যাঁহারা প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের বিলোপসাধনে উদ্‌যুক্ত, তাঁহারা এত সহজে বিনা যুক্তিতে অর্থ ও শক্তিপ্রভাবে পুনর্জন্মতত্ত্ব-খণ্ডনে এত ব্যস্ত!

বেদ-দর্শন ও স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রগুলিও যে এই মতেরই পোষক, সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদি

গ্রন্থকে তো পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্বের আকর বলিলেও চলে। ভগবান বশিষ্ঠদেবও এতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, কোটী কোটী জীব ভব-ভাবনা-ভাবিত চিত্ত লইয়া জন্ম-মরণময় নিয়তিচক্রে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছে। জলস্রোতের ন্যায় অসংখ্য জীবস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে। কেহ বা পূর্ব্ব হইতেই উৎপন্ন রহিয়াছে, কেহ বা বর্ত্তমান সময়ে উৎপন্ন হইতেছে, কাহারও বা একটীমাত্র জন্ম হইয়া গিয়াছে, কেহ বা বহুপূর্ব্বে এমন কি কল্পান্তরে জাত হইয়াছে, কেহ বা এখনই জন্মগ্রহণ করিবে। পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে, আশাপাশবদ্ধ বিবাদবাসনা-ভাবিত জীবসমূহও তেমনি এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে।

আশাপাশ-শতৈর্বদ্ধা বাসনাভাব-ধারিণঃ।
কায়াৎ কায়মুপায়ান্তি বৃক্ষাৎ বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ॥

যে পর্য্যন্ত আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার দর্শন-লাভ না হয়, তাবৎ জীব এই ভবসাগরে আবর্ত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে। পরিশেষে আত্মদর্শন লাভ করিয়া সমস্ত অসৎ পদার্থ অসৎ ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত পরম পদ প্রাপ্ত হয়। "তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে বারিণ্যাবর্ত্তরাশয়ঃ। যাবন্মূঢ়া ন পশ্যন্তি শুদ্ধাত্মানমনন্দিতম্॥ দৃষ্ট্বাত্মানমসৎ ত্যক্ত্বা সত্য-

মাসাদ্য সংবিদম্। কালেন পদমাগত্য জায়ন্তে নেহ তে পুনঃ॥” ভগবান গীতায় “যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম” আদি শ্লোক দ্বারা এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

জীব কোন্ যোনিতে কতবার কিভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভের যোগ্য হয়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে দেখান হইয়াছে। পদ্মপুরাণমতে চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তে জীব সাত্ত্বিক গোজন্ম লাভ করে। “চতুরশীতিলক্ষান্তে গোজন্ম তৎপরং নরঃ।” তমোগুণের মধ্যে বানর-জন্মকে, রজোগুণের মধ্যে সিংহজন্মকে, সত্ত্বগুণের মধ্যে গোজন্মকে শেষ জন্ম বলিয়া সেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই যে ডারুবিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বানর হইতে মনুষ্যের অভিব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলও আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই। “পশ্বাদীনাং লক্ষ-ত্রিংশচ্চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে। ততোহি মানুষা জাতাঃ কুৎসিতাদের্ব্বিলক্ষণম্।” তবে মনে রাখিতে হইবে যে এই ক্রমাভিব্যক্তি জীবগত, দেহগত নহে। পঞ্চকোষ-বিবেকতত্ত্বে দেখান হইয়াছে যে, মনুষ্যজন্মের পূর্ব্বে বিজ্ঞানময়-কোষ ততটা বিকাশ প্রাপ্ত হয় না; এমন কি, মনোময়-কোষকেও ততটা বিকাশপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। কর্ত্তৃত্ববিকাশের তারতম্যেই যে জীবের দায়ীত্ব-তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হওয়া স্বাভাবিক, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহার নিজের কোনও

কর্ত্তৃত্ব নাই, যে অপর কোনও শক্তিবিশেষ দ্বারা কতকটা অন্ধের ন্যায় চালিত হইয়া কর্ম্ম করে, তাহাকে তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য দায়ী ভাবা বা দায়ী করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্য মনুষ্য-জন্মলাভের পূর্ব্বে জীবকে তাহার কর্ম্মফলের জন্য ততটা দায়ী করা হয় নাই; সে পর্য্যন্ত জীব স্বভাবের স্রোতে স্বভাবের প্রেরণায় অনেকটা স্বভাবেরই তালে তালে প্রকৃতির ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে বাধ্য হয় সচেষ্ট থাকে। এই জন্যই বোধ হয় বলা হইয়াছে যে, মনুষ্য-জন্মলাভের পূর্ব্বে জীবের নিম্নদিকে পতন তত স্বাভাবিক নহে; কতকটা যেন অবারিত অবাধিত অনাবিল ক্রমোন্নতির ভাবই সে পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মনুষ্যজন্মে পরিণতির সহায়রূপে অহংতত্ত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্য দিয়া সাধনের পরম সার-তত্ত্বরূপ আত্ম-নিবেদন-রহস্য সার্থক করিয়া তুলিয়া জীবকে পরম কৈবল্যের অধিকারী করিয়া তোলা হয়। মনুষ্যজীবনে উত্থান ও পতন উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং মানুষ যে মুক্তির পূর্ব্বে কতবার জন্মগ্রহণ করিবে তাহা বলা কঠিন। মনুষ্যজন্মের পরেও অশ্বাদি-জন্মলাভ সম্ভবপর কিনা তাহার উত্তরে ভগবান কপিল বলেন,—এ সব কিছুই অসম্ভব নহে। যে যাহা হইতে জন্মে সে তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং নানা যোনি হইতে নানা আকারের জীব জন্মে।

দ্রবীকৃত লৌহ ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হয়। "কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যাণাং তৎস্বভাবতা। নানাযোন্যাকৃতীঃ সত্ত্বো ধত্তেঽতো দ্রুতলোহবৎ॥" গরম লৌহ যেমন নানাবিধ ছাঁচের আকারে আকারিত হয়, জীবও তদ্বৎ আপন কর্ম্মানুসারে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানুষ অতি বৃদ্ধ বয়সে যে ভাবে ভীমরথীগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে ক্রমোন্নতিবাদ যেন তত সহজে স্বীকার করা অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে।... মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াই আমরা প্রকৃতির তালে বাধা দিতে ভগবৎবিধান লঙ্ঘন করিতে ভগবৎশাস্ত্রের অবমাননা করিতে আরম্ভ করি। এইখানেই জীব সংসারবৃক্ষের ফল আস্বাদ করিয়া লোভের পরিণামে আদম ও ইভের ন্যায় পাপকার্য্য সাধন করিতে তৎপর হয়; তাই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াই আমরা শাস্ত্রবিধি পালন করিতে আদিষ্ট হই, এখান হইতেই যে যাবতীয় বিধি-নিষেধশাস্ত্র আবশ্যক হইয়া পড়ে। তারপরে মনুষ্য-দেহ লাভ করিলেই আমরা যে প্রকৃতপক্ষে মানুষ হইতে সমর্থ হই না, নানাবিধ অসভ্য ও বনমানুষ তাহার দৃষ্টান্ত। অনেক জন্ম পরে ইহারা সুসভ্য পরিণত মনুষ্য-দেহ লাভ করিবে। এই জন্যই বোধ হয় বলা হইয়া থাকে যে, ব্রাহ্মণ-দেহ পরিণত মনুষ্য-দেহ লাভ করা বহু জন্মের সুকৃতিসাধ্য। সে অবস্থায়ই আমরা

ভাবশুদ্ধি-রূপ মানসিক তপস্যা দ্বারা বিষয়ভোগকেও ভগবৎ-আরাধনার সাধনার অঙ্গরূপে পরিণত করিয়া জগতের ভিতরে আসিয়া জগতের কাজ করিয়াও জগন্নাথের সেবার অধিকার লাভ করিয়া থাকি। গুণকর্ম্মানুসারে যখন জাতি-ভেদ সাধিত হইত, তখন আমরা তাহার ভিতরে বেশ সুন্দর একটা পরিণতি-তত্ত্ব জন্মান্তর-রহস্য আস্বাদ করিবার সুযোগ পাইতাম। ব্রাহ্মণ-দেহে তখন বাস্তবিকই যে সাত্ত্বিক পরি-নতি পরিলক্ষিত হইত। ব্রাহ্মণের ভাব ও কাজ দেখিয়া তাঁহার বহুজন্মের সাধনার ফল অনুমান করা যাইত। ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমে যে তত্ত্ব শিক্ষা করা হইত, গার্হস্থ্যাশ্রমে কাজের মধ্য দিয়া তাহা পরিণতি লাভ করিয়া পাকা হইয়া পরীক্ষিত হইয়া বানপ্রস্থের বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া নিবৃত্তির ফলস্বরূপ আত্মপ্রসাদ অনেকটা আস্বাদ করিয়া পরিশেষে সন্ন্যাসের দ্বারা কৈবল্যলাভের সহায় হইয়া পড়িত। এ কাজের জন্য মনুষ্য-দেহ লাভ করিবার পরেও জীবকে অনেকবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত। মৃত্যুর পরে জীব স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ লইয়া গমন করে। প্রেতলোকে কিছুকাল বাস করিয়া সে স্বর্গে বা নরকে গিয়া সুখ-দুঃখভোগ করিয়া কর্ম্মফলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। আমাদের উপরে যেমন সপ্তলোক নীচেও তেমনি সপ্তলোকের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

পিতৃযান ও দেবযান অথবা দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে। বাল গঙ্গাধর তিলক যে ভাবে ছয়মাস-ব্যাপী উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন কথাগুলি দেখিয়াই আর্য্যজাতিকে উত্তর-মেরুর অধিবাসীরূপে প্রমাণ করিতে তৎপর হইয়া এই সাধনতত্ত্বকে গ্রহের গতি-বিধিতে পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা তত সহজে ইহাকে শুধু সেই ভাবে সীমাবদ্ধ ভাবিতে সমর্থ নহি। উপনিষদাদি-গ্রন্থে মনের একটা সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; মন বিষয়সংস্কারের সাহায্যে যতদূর যাইতে পারে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব সাধনতত্ত্বকে তাহার উপরে স্থাপন করিতে চেষ্টা হইয়াছে। মন কল্পনাজল্পনা লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহার ভাবগুলিকে সে সাধারণতঃ কর্ম্মের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া বাহির করে। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র; সুতরাং মনোময়-কোষ পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকের অধিকার হওয়াই স্বাভাবিক। কর্ম্ম দ্বারা যতটা যাওয়া যায়, কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু পাওয়া যায়, কর্ম্মফল ভোগের পরে তাহা হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসাই যে স্বাভাবিক! এই জন্যই কর্ম্মসাধ্য চন্দ্রলোক ক্ষয়স্বভাব-বিশিষ্ট; তাই পুণ্যক্ষয়ে এই মানসিক স্বর্গরাজ্য হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"। গীতায় মানসিক সুখভোগকে আগমাপায়ী অনিত্য, এমন

কি দুঃখের আকর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মনের অধিকারের উপরে রহিয়াছে দেবযানমার্গ, দেবতারা সে পথের চালক ; জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানলোকের মধ্য দিয়া আত্মরাজ্য পর্য্যন্ত ইহা প্রসারিত। এই স্রোত সর্ব্বদা উর্দ্ধগামী ; এই পথের পথিক হইতে পারিলে সাধককে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। সেখানে জন্ম-মৃত্যুর পরপারে ভগবৎধামে গিয়া সাধক পরম শান্তি লাভ করেন। সেখানকার সুখ মন কল্পনায়ও আনিতে পারে না—সে সুখ যে আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ ; সেখানে অহংএর বিষয়বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব নাই বলিলেই চলে। এই যে চন্দ্রলোকের সুখ, ইহা নিম্নাধিকারীর নিকট আরামপ্রদ আনন্দদায়ক হইলেও জ্ঞানিগণ কিন্তু এই স্বর্গসুখকে তুচ্ছ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে ক্ষয়-বৃদ্ধিশীল আগমাপায়ী অনিত্য স্বর্গ-নরকেরও বহু উর্দ্ধে অমৃতলোকে ব্রহ্মধামে গিয়া অক্ষয় আনন্দ-রসে বিভোর থাকিতে ইচ্ছা করেন। কোথাও যে স্বর্গকে অমৃতধামরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মানসিক স্বর্গের উপরিস্থ ব্রহ্মধামের গোলোকধামের একটা আভাস অবলম্বনে লিখিত। কোরাণ ও বাইবেলের বর্ণিত স্বর্গ অনেকস্থলে পিতৃযানের দক্ষিণায়নের ভোগ্য মানসিক স্বর্গের তুল্য, যদিও সেখানে উত্তরায়ণের ব্রহ্মধামের আভাসও অনেকস্থলে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দেবযান-মার্গ সম্বন্ধে বেশী বলিতে

চেষ্টা না করাই ভাল ; কারণ সেখানে মানুষের কর্ত্তৃত্ব খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সেখান পর্য্যন্ত পৌছিলে একজন অমানব পুরুষ আসিয়া জীবকে ব্রহ্মধামে লইয়া যান। মহম্মদের জীবনেও এই অপ্রাকৃত পুরুষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে আর ফিরিয়া আসার কোনও ভয় থাকে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই উত্তরায়ণ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় :—

> "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষ-
> মভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ আপূর্য্যমানপক্ষ-
> মাপূর্য্যমানপক্ষাদ্‌যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাং-
> স্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাৎ
> আদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং
> তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ
> দেবযানঃ পন্থাঃ"।

"এই যাঁহারা (নিবৃত্তিমার্গগামী) অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা-তপস্যাদি দ্বারা উপাসনা করেন, তাঁহারা (দেহান্তে) সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন ; তাঁহারা অর্চ্চ্যভিমানী দেবলোক, দিবাভিমানী দেবলোক, আপূর্য্যমান-পক্ষ দেবলোক, ষন্মাস দেবলোক, সম্বৎসর-দেবলোক, আদিত্য-দেবলোক, চন্দ্রমা দেবলোক পার হইয়া বিদ্যুৎ-দেবলোকে গিয়া উপস্থিত হন।

তারপরে এক অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মধামে লইয়া যান, ইহাই দেবযান পন্থা।" এই ব্রহ্মলোক বা সপ্তম-লোকে গেলেই জীব মুক্তিলাভ করে। ভক্তগণ এই সপ্তম লোককে শিবলোক বিষ্ণুলোক খ্রীষ্টলোক আদি নামে বর্ণনা করেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা সালোক্য সামীপ্য আদি রূপে মুক্তিলাভ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের সেবানন্দে বিভোর থাকেন। কাহারও মতে এই সব লোক যেন ব্রহ্মধামেরও উপরে অবস্থিত; জ্ঞানিগণ আবার এই সব লোককে ব্রহ্মধামের নীচে ষষ্ঠলোকে রাখিয়া কৈবল্য-ধামকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সপ্তমলোক বলিয়া বর্ণনা করেন। দেবী ভাগবতাদি-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, সিদ্ধ পুরুষগণ শিবাদিলোকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আপন আপন ইষ্টদেবের সেবানন্দে বিভোর থাকিয়া পরিশেষে মহাপ্রলয়ে পরম নির্ব্বাণরূপ উত্তরায়ণ-মার্গের চরম গম্যস্থানে গিয়া উপস্থিত হন। মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও এভাবের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। "তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তে সর্ব্বে।" দক্ষিণায়ন পথকে সকাম কর্ম্মমার্গকে ধূমযান-মার্গ বলা হইয়াছে। ইহা যেন বৈদিক সকাম কর্ম্ম যজ্ঞের বহ্নির ধুঁয়াতে পরম ব্রহ্মতত্ত্বকে কতকটা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। মানব বহু জন্মান্তে কর্ম্ম-তত্ত্বের • জগৎরহস্যের সার তত্ত্ব অবগত হইয়া নিষ্কাম

কর্ম্মের সাহায্যে উত্তরায়ণ-পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। সেখানেও বহু-জন্মান্তে সেই পথের গম্যস্থানে পৌঁছিয়া পরম নির্ব্বাণ-পদ লাভ করে। শেষ পর্য্যন্ত যাওয়ার আগে যাওয়ার শেষ নাই, আর এই সমস্ত যাওয়া বহুজন্ম-সাপেক্ষ; তাই মুক্তিবাদী আর্য্যগণ পুনর্জ্জন্ম-বাদকে স্বীকার করিতে বাধ্য।

নরকভোগ

বৌদ্ধধর্ম্ম স্বর্গ-নরকের অদ্ভুত বর্ণনা দ্বারা মানুষকে কুপথ হইতে সুপথে আনিবার চেষ্টা করেন। এই বর্ণনা অত্যধিকভাবে অতিরঞ্জিত হইলেও ইহার ভিতরে যে মোটেই সত্য নিহিত নাই, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কর্ম্মবাদ কর্ম্মফল-রহস্য মানিতে হইলে কুকর্ম্মের যখন সীমা নাই, তখন ব্যক্তিবিশেষের জন্য যে নরকবিশেষ লোকবিশেষ বিশেষভাবে দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। গীতাকারও বলিয়া গিয়াছেন--মানুষ যে ভাবে কর্ম্ম করিবে যে ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে, মৃত্যুকালে 'তাহার

চিত্তে তদনুকূল ভাবই প্রবল হইয়া সেই সেই ভাবনারাশি অবলম্বনে একটা ভাবনাময় দেহ প্রস্তুত করিয়া লইবে। সেই ভাবনাময় দেহ অনুসারে জীবের দেহান্তে সুখ-দুঃখভোগ এবং ভোগক্ষয়ে জন্মান্তরপ্রাপ্তি অনেকটা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যাহারা যৌবনে ধনমদে মত্ত হইয়া অত্যাচার ব্যভিচার আদি কুকর্ম্ম করিয়া গিয়াছে, মৃত্যুসময়ে তাহাদের সে সব দুষ্কৃতির সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত সংস্কারগুলি সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবে। তাহাদের তীব্রতা এত বেশী যে, তাহারা তখন আর বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবারও অবকাশপ্রাপ্ত হইবে না। ইহারই ফলে অনেক পাপী মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন আপন কৃতপাপের অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। কেহ কেহ বা সেই সব সূক্ষ্ম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে অধীর হইয়া পড়ে। সাধু-মহাত্মাগণ আবার মৃত্যুকালে আপন আপন সাত্ত্বিক কর্ম্মের পরিণতি অনুসারে অনেক অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন, অনেক সময় পরলোকগত-পুণ্যাত্মা বা দেবতাদের দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই মৃত্যুকালে যমদূত শিবদূত বা বিষ্ণুদূত নামক স্বর্গীয় দেবতাদের আগমনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দুশাস্ত্র প্রেতলোকে অবস্থানকে অনেক স্থলেই সাধারণ

জীবের পক্ষে কষ্টকররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যে জীব স্থূলের আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে নাই, স্থূল ব্যতীত সূক্ষ্মতত্ত্ব-ভোগে অক্ষম—শুধু সূক্ষ্মতত্ত্ব লইয়া তৃপ্ত থাকিতে অনভ্যস্ত, তাহাদের যে প্রেতলোকে অবস্থানকালে কামনা-বাসনা চলিতে থাকিবে অথচ তাহার উপযুক্ত স্থূল উপকরণ লাভ করা যাইবে না, ইহাতো বাস্তবিকই পরিতাপের কথা! ইহা ছাড়া হিন্দুশাস্ত্র অপঘাতে মৃত ব্যক্তির জন্যও প্রেতলোকে নানারূপ কষ্টের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহাদের কষ্টকেই ভীষণভাবে বর্ণনা করিয়া শাস্ত্র জীবকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার যাঁহারা দেশের জন্য জীবহিতের জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তাঁহাদের জন্য দেহান্তে উর্দ্ধগতির স্বর্গ-সুখভোগেরও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বজ্রাঘাত নৌকাডুবি রেলের দুর্ঘটনা আদির জন্য যাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের জন্যও যে ভাবে প্রেতলোকে নরকে দুঃখকষ্টভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা সব সময় বুঝিয়া উঠা তত সহজ নহে। তবে তাহার মধ্যেও অদৃষ্টকে দৈবকে প্রাধান্য না দিয়া জীবের আপন আপন কর্ম্মফলকে যদি ঐ ভাবের মৃত্যুর কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তবে ঐসব

বর্ণনাকেও অগ্রাহ্য করা ততটা সহজ বলিয়া মনে হয় না। মনুসংহিতা প্রভৃতিতে নরকবিভাগ ও তথায় শাস্তি-ভোগের বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সব প্রেতলোকবাসী আত্মার তৃপ্তিলাভের জন্য হিন্দুগণ তর্পণ-শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। প্রেতলোককে অনেকটা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। এই মূর্চ্ছাভাব দূর করিবার জন্য যতরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে মনন-শক্তি মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যশক্তির প্রভাবই বিশেষভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। পুত্র পিতার কল্যাণের সহায়, নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করিবে বলিয়াই নাকি পুত্র কামনা করা হয়। দেহান্তে পিতার আত্মা যে স্ত্রী-পুত্রাদির কল্যাণসাধনে সুখবিধানে বিরত থাকে, আস্তিকের পক্ষে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেজন্য কাহারও মৃত্যুতে যে তাহার আত্মীয়স্বজনের সব কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় লোপ পায়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না; সুতরাং পিতামাতার মৃত্যুর পরে সন্তানাদির পক্ষে তাঁহাদের পারলৌকিক 'আত্মার কল্যাণের জন্য যথা-সম্ভব চেষ্টা করা আমরা পিতৃমাতৃভক্ত আদর্শ সন্তানগণের পক্ষে বিশেষভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। মনন-শক্তি মন্ত্র-শক্তি যে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত আত্মার উপরে কার্য্য করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; তবে স্থূল দ্রব্যশক্তি যে

কিভাবে কার্য্য করে, তাহা সব সময় বুঝিতে পারা তত সহজ নহে। দ্রব্যবিশেষ যে সূক্ষ্মতত্ত্বের বাহক সূক্ষ্ম-তত্ত্বকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থূল তার সূক্ষ্ম বিদ্যুতাদির আগমনের সহায়। বাল্যাবস্থায় অনেক দিন স্বপ্নে সূক্ষ্ম আত্মা দর্শন করিয়াছি; তাহার মধ্যে কোন কোন দিন তাঁহাদের নিকট শুনিতে পাইতাম যে, আমার কাছে লৌহাদি ধাতুবিশেষের অবস্থান হেতু তাঁহারা আমার বিশেষ কাছে আসিতে অক্ষম। এখন যেন সে সব কথার মধ্যে কিছু কিছু সত্যের আভাস দেখিতে পাই। যব তিল দধি মধু তণ্ডুল কলা আদির মধ্যে বিশেষ-ভাবে ঐজাতীয় কোনও আকর্ষণ-শক্তি বর্ত্তমান আছে কিনা, পদার্থতত্ত্ববিৎ সূক্ষ্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন; তবে মৃত আত্মার প্রিয়বস্তু-দর্শন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের কল্যাণের আশায় উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদের প্রিয় দ্রব্যগুলির অর্পণ যে, তাঁহাদের প্রীতির সহায় তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে অনেকটা বাড়াবাড়ি হইয়া থাকিলেও ইহার ভিতরে যে কোনও তত্ত্বই নিহিত নাই, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদির মন্ত্রগুলি ভালভাবে বুঝিয়া পাঠ করিলে অনেক স্থলে শুধু পাঠক কেন শ্রোতাকেও ভাবে বিভোর হইয়া যাইতে হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। সেই সব মন্ত্রগুলির

ভাবোদ্দীপন-শক্তি যে শুধু স্থূলে সীমাবদ্ধ থাকিবে, সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত আত্মার উপর কোনও রূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না, তাহা জোর করিয়া বলিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে। যমলোকে নরকে যাতনা-ভোগের বর্ণনা অনেক পুরাণে প্রায় সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের পারলৌকিক দেহের যতটা কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, কৃতজ্ঞহৃদয় ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। যমলোকে বৈতরণী নদী পার হওয়ার সময় মৃত আত্মা কি ভাবে বিলাপ করে, তাহার অল্লাধিক বর্ণনাও প্রায় সকল পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যাঁহারা বিশেষভাবে পাপাসক্ত, তাঁহারাই এ জাতীয় নরকের ভয়ে অধীর হইয়া পড়েন।

গ্রহ-উপগ্রহাদির অধিকাংশই জীবে পরিপূর্ণ। ইহাদের গুণজনিত তারতম্যানুসারে ইহারা গুণজনিত ভেদাপন্ন জীবের গন্তব্য স্থানরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কোন গ্রহ ক্ষিতি, কোন গ্রহ অপ্, কোন গ্রহ তেজ, কোন গ্রহ বা বায়ুতত্ত্ব-প্রধান। যে জীব কর্ম্ম দ্বারা সাধনা দ্বারা যে তত্ত্ব প্রধানরূপে গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে সেই লোকে গমনই স্বাভাবিক। এই সমস্ত অসংখ্য লোকের মধ্যে আবার পৃথিবী হইতে উপরের এবং নীচের লোকগুলিকে

সাত-সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোক ক্রমবিকাশ অনুসারে উর্দ্ধদিকের স্তরবিশেষ; আবার অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল এই সাতটি লোক নীচের দিকে অবস্থিত। নীচের এই লোকগুলি তমপ্রধান এবং উপরের লোকগুলি সত্ত্বপ্রধান। তাই নীচেরগুলিতে অসুরদের এবং উপরের-গুলিতে দেবতাদের বাস। মাঝখানে নাকি রহিয়াছে উভয়াত্মক আমাদের এই পৃথিবী। এই উর্দ্ধস্তরের তৃতীয় লোক (স্বর্গ) পর্য্যন্ত বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা বিশেষভাবে বর্ত্তমান। দেহান্তে সকলেরই যে এই পৃথিবীতে আসিয়া আবার জন্মলাভ করিতে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সাধন-বলে যাহার চিত্ত যে লোকের অনুকূল হইয়া গিয়াছে, সে দেহান্তে সেই লোকে গিয়া জন্মলাভ করিবে। কর্ম্ম-কাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের সাধনপ্রণালী ও অবস্থা-গুলিকেও এই জন্য সপ্তধা বিভক্ত করা হইয়াছে। এজীবনে যে সাধক যে ভূমিতে থাকিয়া সাধন করিবেন, যে ভূমিতে বাস করিবার অধিকার লাভ করিবেন, দেহান্তে তাঁহাকে সেই ভাবপ্রধান লোকে সেই ভাবপ্রধান আধার লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে। যোগশাস্ত্রে মেরুদণ্ডের সপ্ত কেন্দ্র অবলম্বনে সপ্ত লোকের জ্ঞানভূমির সাতটি স্তরের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

•বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্র জীবের গর্ভবাস অবস্থাকে সুখদুঃখ-

বোধরহিত বলিয়া বর্ণনা করিলেও প্রাচীন শাস্ত্র কিন্তু এ অবস্থাকে যন্ত্রণাবিশেষ বলিয়া বর্ণনা কবিয়া গিয়াছেন। তবে সিদ্ধ-মহাত্মাদের যে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, শাস্ত্রে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময় সুখ-দুঃখের বোধশক্তি থাকে কি না কে তাহার সাক্ষ্য দিবে? বিশ্বাসীর নিকট আর্ষগ্রন্থ এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অবিশ্বাসী যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা ইহার বিরুদ্ধে কোনও তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে অক্ষম থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রপ্রমাণকে গায়ের জোরে খণ্ডন করিতে যাওয়াও আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। প্রায় সব শাস্ত্রেই গর্ভবাসকালীন ভগবৎসকাশে প্রার্থনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও মতে একবার এই গর্ভবাস হইতে উদ্ধার পাইলে আর শ্রীভগবানকে ভুলিয়া যাইব না, আর তাঁহার বিধানের অবমাননা করিয়া কুপথে চলিব না, এইভাবের বহু প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবী মায়াপ্রভাবে নাকি আমরা এসব কথা পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত ভুলিয়া যাই। মায়া যে সমস্ত স্বরূপবিস্মৃতির কারণ, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। দেবী যোগমায়া এমন কি মায়াধীশ কৃষ্ণচন্দ্রকেও লইয়া যে কিভাবে লীলা-রসের বিস্তার সাধন করেন, তাহা বৈষ্ণব সাধকদের নিকট সুপরিচিত তত্ত্ব। শাক্তদের তো দেবী মহামায়াই আরাধ্যা দেবী, এমন কি মুক্তিলাভ ভগবৎপ্রাপ্তিও যে তাঁহারই কৃপাসাপেক্ষ।

…সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত আত্মা স্থূলদেহ ধারণ করিতে স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে সক্ষম কিনা, এবিষয়েও হিন্দুশাস্ত্রে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। যোগীদের পক্ষে সিদ্ধ-মুক্ত পুরুষদের পক্ষে এসব কাজ অসম্ভব বলিয়া কখনও স্বীকার করা হয় নাই। পরকায়প্রবেশ-তত্ত্বে তাঁহাদের একদেহ সত্ত্বেও অন্যদেহে প্রবেশ করিয়া কাজ করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রেতদেহের স্থূলরূপ অন্ততঃ বায়বীয় দেহ ধারণ করিয়া আত্মীয়স্বজনদের নিকট উপস্থিত হওয়ার কথা অনেক সময় অস্বীকার করিবার ইচ্ছা হয় না। শাস্ত্রে প্রেতদেহে বা সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত যোগী ও ভোগী উভয়েরই স্থূলদেহ ধারণ করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় : তবে যোগীরা যে কোনও দেহ ধারণ করিয়া দেখা দিতে পারেন, আর ভোগীরা শুধু নিজের বাসনানুসারে আপনার ত্যক্ত দেহের সদৃশ দেহ ধারণ করিতে সমর্থ। মৃত পতি বা স্ত্রী মাতা বা সন্তান, (যথাক্রমে) স্ত্রী বা স্বামী সন্তান বা মাতার নিকট আসিয়া দেখা দিয়াছেন, এমন কি কথা বলিয়া আত্মীয়স্বজনের প্রাণে শান্তি দিয়াছেন, এরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। পরলোকগত আত্মার বায়বীয় তেজোময় বা ছায়াময় দেহধারণের কথা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, সাধু ও অসাধু ব্যক্তি দেহান্তেও লোকের উপকার বা অপকার-সাধনের প্রবৃত্তি দূর করিতে না পারিয়া জীবের

সুখদুঃখের কারণ হইয়া থাকেন। মৃতা স্ত্রী তাহার সপত্নীকে কি ভাবে আসিয়া সময় সময় অস্থির করিয়া তোলে, তাহার কথা শুনিয়া অনেক সময় অবাক্ হইয়া যাইতে হয়! যে সকল প্রেত উদ্বন্ধনে বা জলমজ্জনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহারা নাকি লোককে বিশেষতঃ প্রিয়জনদিগকে ঐভাবে প্রাণত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎসাহিত করে। প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিবার ব্যবস্থা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকবিশেষের ভিতরে এবং তন্ত্রাদি-শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই ভাবে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব ও কার্য্যপ্রণালী এপর্য্যন্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নূতন নূতন আবিষ্কারের মধ্য দিয়া আমরা একদিকে যেমন প্রেতলোকবাসীর কার্য্যকলাপে বিশ্বাস করিতে উৎসাহিত হই, অন্যদিকে আবার প্রেততত্ত্বের অনেক ব্যাপারকে তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানসিক ক্রিয়াবিশেষে পর্য্যবসিত করিবারও সুযোগ যে পাইনা তাহা বলা যায় না। কর্ম্ম মাত্রই যখন কারণের বহিঃপ্রকাশ, যাহা বীজরূপে সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকে তাহাই যখন স্থূলে বৃক্ষরূপে পরিণতি লাভ করিয়া স্থূলদৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তখন সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত সংস্কারগুলি সময়বিশেষে ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে কেন যে তীব্রতাযোগে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারিবে না, তাহা আমরা বুঝিয়া

উঠিতে অক্ষম। তবে মানসিক-বিষাদগ্রস্ত ভীরু লোকগুলি যে ভাবে প্রেতলোকে বিশ্বাস করিতে গিয়া ভূতের ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে, তাহা বাস্তবিকই মহা দুঃখের কথা বলিয়া মনে হয়। আমরা ভগবানে বিশ্বাস করি। ভগবৎবিধান-গুলিকে আমরা অমোঘ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, ভগবান যে কি ভাবে আমাদের কল্যাণসাধনে আনন্দবিধানে তৎপর তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি; সুতরাং আমাদের প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস আমাদিগকে ভীত না করিয়া সাহসী করিয়া তোলে, অলস না করিয়া উৎসাহিত করিয়া থাকে, কর্ম্মফলকে ভগবৎবিধানগুলিকে আরও সুন্দরভাবে পালন করিতে শিক্ষা দিয়া থাকে। আমরা যতটুকু নরকে বিশ্বাস করি তাহাও যে ভগবৎবিধানকে মঙ্গলপ্রদ ও অমোঘ জানি বলিয়াই। যে বিধানকে মানে জানে পালন করে, ভগবানের রাজ্যে সর্ব্বত্র তাহার অবারিত দ্বার অবাধিত গতি। জগতের সব ঘটনাই তাহার আনন্দের সহায়।

যদি কর্ম্মরহস্য ভগবৎবিধানের অন্তর্গত ভগবৎইচ্ছা-পূরণের সহায়ই হয় তবে যাহারা ভগবৎপথে ন্যায়ানুমোদিত রাস্তায় চলে, যাহারা জীবনে সজ্ঞানে কখনও কোনও অন্যায় কাজ করে নাই, কাহারও মনে আঘাত দেয় নাই, তাহাদের মধ্যেও অনেক লোককে কেন এত কষ্ট পাইতে দেখা যায়? আর যাহারা দুর্বৃত্ত অহংকারী হিংসুক পাপাচারী তাহাদের মধ্যেও অনেকে কেন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া পার্থিব সুখভোগে লোক-প্রশংসা-লাভে সমর্থ হয়! ভাল কাজের ফল সুখ, মন্দ কাজের ফল দুঃখ, ইহাই তো স্বাভাবিক হওয়া উচিত। যাহারা সুখ-দুঃখের স্বরূপ ও পরিণাম-ফল বিশেষভাবে অবগত নহে, যাহারা সুখ-দুঃখের একটা মাত্র সীমাবদ্ধ অবস্থা দেখিয়া ইহাদিগকে শুধু স্থূলে পর্য্যবসিত মনে করে, তাহাদের মনে এইজাতীয় সন্দেহ আসাই যে স্বাভাবিক; কিন্তু যাহারা সুখ দুঃখকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিকরূপে বিভক্ত জানিয়া, স্থূল সুখের উপকরণগুলি যে সব সময় মানসিক

সুখবিধানে সমর্থ হয় না, এবং মানসিক সুখ-দুঃখও যে শুধু কতকগুলি স্থূল উপকরণে সীমাবদ্ধ নহে এই তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, তাহারা অত্যাচারী ধনী কুপথগামী নরপতি আদির মানসিক অশান্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম্মপথের ন্যায়বিধান কর্ম্মফল-দাতার সমদর্শিতা ও বিচারবুদ্ধির পারদর্শিতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তবে ইহার মধ্যে এমন লোকও দেখা যায় যাহারা ধনী কুপথগামী অত্যাচারী ও পাপে রত হইয়াও চিরদিন মনের সুখে কালযাপন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও মানসিক অবস্থা এত অনুন্নত যে তাহাদিগকে মানুষ না বলিলেও চলে। আবার ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যেন পূর্ব্বজন্মের পূর্ব্বকর্ম্মের ফলগুলি এইভাবে শেষ করিয়া ভবিষ্যতের পথ আরও অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বজন্ম-তত্ত্ব কর্ম্মফল-রহস্য বিশেষভাবে বিচার করিতে না পারিলে এ সব সন্দেহ দূর হইবার নহে। শরীরের সঙ্গে মনের অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও সব সময় যে শরীরের সব কাজ মনের উপর বিশেষভাবে আধিপত্য করিবে তাহা বলা যায় না। মানসিক সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইলেই যে সব সময় তাহার বাহ্য বিকাশ বাহিরের কর্ম্মানুষ্ঠানও সৎভাবের বোধক হইয়া সৎফল প্রদান করিবে তাহারও স্থিরতা নাই। অনেক সময় জীবের কল্যাণ করিতে গিয়া স্থূলতঃ তাহার সমধিক অকল্যাণই সাধিত করিয়া ফেলা হয়। তবে যেখানে কোন

সূক্ষ্ম পবিত্র ভাব সেই কর্ম্মের চালক, সেখানেই উহার অনুষ্ঠান চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। মনে কর, আমি যদি কতকগুলি লোকের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাহাদের প্রাণবিনাশেরই কারণ হইয়া পড়ি, তবে আইনের চোখে আমি কতকটা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও তাহার ফলে যে আমার চিত্ত বিশেষভাবে কলুষিত হইবে তাহা বলা চলে না। অপর দিকে কাহারও অনিষ্ট করিতে গিয়া ভ্রমবশে যদি তাহার ইষ্ট সাধন করিয়া ফেলি, তবে উহার ফলে লোকদৃষ্টিতে প্রশংসা লাভ করিলেও ভগবৎবিধানে যে আমার চিত্ত কলুষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই: আদর্শ জীবনে এই ভিতর-বাহিরের বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের চক্ষে বাহিরের ভাব দেখিয়া ভিতরের ভাব অনুমান করা সব সময় সুসঙ্গতও মনে হয় না। বাহিরের ঐশ্বর্য্য সুখের উপকরণ শান্তির একটা ভাণের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মদর্শী অনেক সময় দীনতা-হীনতা দুঃখ-কষ্ট অশান্তির সদ্ভাব দেখিয়া থাকেন। স্থূল কর্ম্ম অনেকটা যেমন স্থূল বিভূতির স্থূল সুখের সহায়, সূক্ষ্মকর্ম্মও আবার তেমনি সূক্ষ্ম বিভূতির মানসিক সুখের সহায়; স্থূলদান যেমন জগতে প্রশংসার ভাজন করিয়া তোলে, সূক্ষ্মদানের প্রবৃত্তিও এমনকি স্থূলভাবে কষ্টনিবারণে অক্ষম হইয়াও চিত্তশুদ্ধির সহায় হয়। পুরাণে দেখান হইয়াছে, ভাগবতের পাঠক মুখে ভাগবতের কথা

শুনাইতে থাকিয়া মনে মনে পাপীর পাপানুষ্ঠানের কথা ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া যমদূতের লাঞ্ছনা ভোগ করিল ; আর কুকার্য্যে রত কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি মনে মনে সেই ভাগবতপাঠকের সৎকার্য্যের চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যে বেজীর দেহার্দ্ধ পূর্ব্বে সুবর্ণময় হইয়া গিয়াছিল, তাহার অপরার্দ্ধ কোথায় কিভাবে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। বিদুরের শাকান্নের মূল্য কেন যে মহারাজ দুর্য্যোধনের রাজভোগ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই আমাদের সব সময় ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করা উচিত। বাহিরের একটা অসার চাকচিক্য দেখিয়া দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে। ভারতবাসী কাজের মূল্য অপেক্ষা প্রাণের মূল্যকে চিরদিন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। পাচকের অন্নে স্থূলদেহের পুষ্টি সাধিত হইলেও মাতার অন্নে যে কিভাবে দেহের প্রাণের মনের, এমন কি আত্মার পর্য্যন্ত পুষ্টি তুষ্টি পরিণতি সাধিত হয়, তাহা তাঁহারা কখনও ভুলিয়া যাইতেন না। পাশ্চাত্য জগৎ কর্ম্মফল কতকটা মানিলেও বাইবেলে কতকটা বিশ্বাসী হইলেও পুনর্জন্ম-রহস্য আস্বাদ করার অভাবে জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটী সুসজ্জিত সামঞ্জস্য বাহির করিতে না পারিয়া সুখ-দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব না জানিয়া স্বাধীনতার নামে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার পথ পরিষ্কার করিতে

বসিয়াছেন। কৌশল কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? 'কত ক্ষণ রহে ঢিল শূন্যেতে মারিলে?' প্রকৃত দর্শনশক্তির অভাবে আজ সংসার নরককুণ্ডে পরিণত হইতে বসিয়াছে। অর্থই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া সর্ব্বদা আদৃত হইতে পূজা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। অর্থের জন্য মানুষ আজ না করিতে পারে এমন কাজ নাই। যাহার অর্থ আছে সে-ই আজ পণ্ডিত ধার্ম্মিক সাধু, ভিতরে সে যতই অত্যাচারী কুক্রিয়ারত নরকের কীট হউক না কেন! অর্থকেই যাহারা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ মনে করে, অর্থই যাহাদের যথাসর্ব্বস্ব তাহারা সুখ-দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া কে সুখী কে দুঃখী তাহা ঠিকভাবে নির্ণয় করিবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সমস্ত বৈষম্যের কারণ কর্ম্মফল, সমস্ত বৈষম্যের কারণ অমোঘ ভগবৎবিধান। "মতিমতাংশ্চ বিলোক্য দরিদ্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ।" রামচন্দ্রের যুধিষ্ঠিরের দুঃখভোগ দর্শন করিয়া ভগবৎকৃপা-বিশ্বাসী ঋষি-মুনিগণ কর্ম্মফলদাতা বিধাতাকেই বলবান বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি কি সহজে কর্ম্মকে নমস্কার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন "নমস্তৎ-কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।"

পুরাণাদি গ্রন্থপাঠে জানা যায়, মানুষ পূর্ব্বউপার্জ্জিত সুকৃতিবিশেষের ফলে অতুল ধন লাভ করে এবং এই জন্মে সেই ধনের অপব্যবহার করিয়া—হয় এই জন্মে

না হয়তো পর জন্মে—অর্থাভাবে কষ্টভোগ করে। যে ধনদান করিয়াছে সে ধনলাভ করিবে, যে প্রাণদান করিয়াছে সে প্রাণলাভ করিবে এবং যে শান্তিদান করিয়াছে সে শান্তিলাভ করিবে, ইহাই তো ভগবৎবিধান। এই জন্য তো অনেকে ধনলাভ করিয়াও মনে শান্তি পায় না। ভগবানের নিকট যে যাহা চায় সে তাহা লাভ করে, তবে চাওয়াটা ঠিক হওয়া চাই। যে নামের জন্য দান করে সে নাম পায়, কিন্তু শান্তি পায় না; যে অর্থের সঙ্গে প্রাণটাও দান করে সে-ই অর্থদান করিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করে। যে যাহা পূর্ব্বজন্মে চিত্রগুপ্তের খাতায় গচ্ছিত রাখিয়াছে, সে এই জন্মে তাহার সেই গচ্ছিত ধন ভোগ করিবার সুযোগ লাভ করিবে। খারাপ লোকে যদি ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া থাকে তবে সেও যে ব্যাঙ্ক হইতে সুদ সমেত সে টাকা ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু এখন যদি সে ঐ টাকার অপব্যবহার করে, কুকার্য্যে উহা উড়াইয়া দেয়, তবে ভবিষ্যতে সে যে অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তারপরে যে ব্যক্তি অর্থকে পরমার্থ ভাবিয়া অর্থের জন্য সব ত্যাগ করিবে,—দেহনাশ করিয়া ধর্ম্মনাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, সে ভবিষ্যতে অর্থলাভ করিলেও স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভে বঞ্চিত থাকিয়া যে কষ্ট পাইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। যে কেবল জমা করিয়াছে—সৎকার্য্যে, নিজের কিংবা আত্মীয়স্বজনের ভোগে উহা ব্যয় করে নাই, সে পরজন্মে ধনী হইলেও কৃপণ হইয়া

ভোগজনিত সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। চলিত কথায় বলে 'পূর্ব্বজন্মে যে সন্দেশ দান করে নাই, সে এজন্মে ধনী হইলেও সন্দেশ খাইবে কি করিয়া ?' আমরা একজন ধনী দেখিয়াছি যাহার ভোগের যথেষ্ট উপকরণ ও প্রবৃত্তি থাকিলেও ভোগের সামর্থ্য মোটেই দেখিতে পাওয়া যাইত না। পূর্ব্বজন্মে যে অন্যের পুত্রবধের কারণ হইয়াছে এজন্মে সে পুত্রশোকে কষ্ট পাইবে। পূর্ব্বজন্মে তুমি কাহারও প্রাণবধ করিয়া থাকিলে এজন্মে তোমায় যে তাহারই বধ্য হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। পূর্ব্বজন্মে যে কর্কশভাষী ছিল এজন্মে সকলের নিকট গালাগালি খাওয়াই যে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য! "ন দত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং শূকর-মুখঃ।" অন্যকে গালাগালি করার ফলে আমার মুখ কদাকার হইয়াছে। অন্যের সুখহরণের ফলে নিজে কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। যদি সুখে জীবন চালাইতে চাও অন্যকে সুখী করিতে চেষ্টা কর। এ জীবন যেভাবে কাটাইবে ভবিষ্যতে ঠিক তাহারই অনুরূপ জীবন লাভ করিবে। গরীবের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর, দীনবন্ধু তোমার দুঃখ দূর করিবার সুযোগ পাইবেন; তাঁহার জীব তোমার দুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট থাকিবে। এজন্মে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছ সেজন্য পরকে দোষী করিতে যাইও না, মনে রাখিও এজন্য তুমি নিজেই দায়ী; তোমারই অতীত কর্ম্মের ফল বর্ত্তমানে এইভাবে ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছ। পরের সুখ দেখিয়া

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিও না, সে উহা তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমানে সে যদি উহাদের অপব্যবহার করে, তবে সেও ভবিষ্যতে অর্থের অভাবে শক্তির অভাবে তোমার ন্যায় কষ্টভোগ করিবে। পরকে সাহায্য করিতে গিয়া ভাবিও না তাহার কর্ম্মফলভোগে বাধা দিলে, তাহার প্রতি দয়া করিলে ; বরং ঐ কার্য্যের জন্য তুমি নিজেই যে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ, তোমাকে এইভাবে পরোপকার করিবার সুযোগ দিয়া ভগবান যে তোমার চিত্তশুদ্ধির সহায় হইলেন, সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিয়া যাইও না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিতে চেষ্টা কর জ্ঞানী ভক্ত সাধকগণ কেন অর্থকে অনর্থ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কেন তাঁহারা যাবতায় ভোগোপকরণ হইতে দূরে বাস করিতেন, কেন তাঁহারা দুঃখ-অসুবিধাকে এত আনন্দের সহিত বরণ করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা কোনও মতে একবার ভিতরকার শান্তির আস্বাদ পাইয়াছেন, বাহিরের সম্পদ ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য কিভাবে অনেক সময় ভিতরকার শান্তিনাশের কারণ হয় সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা কি আর বাহ্য সুখ-ঐশ্বর্য্য কামনা করিতে পারেন? "সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাং কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্" শান্তচিত্ত ব্যক্তি সন্তোষামৃত পান করিয়া যে আনন্দে বিভোর থাকেন, ধনলুব্ধ ব্যক্তি আর সেই সুখের আস্বাদ কি করিয়া

লাভ করিবেন ?...অনেক সাধুপ্রকৃতির লোক অর্থাভাবে লোকপীড়নে যে কষ্টভোগ করেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা নিজের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট সংযম করিয়াছেন, অনেক সাধনভজন করিয়াছেন, কিন্তু পরোপকারাদির আবশ্যকতা বুঝিয়াও কাজে কিছুই করেন নাই। পাছে সাধনের বিঘ্ন ঘটে, পাছে নিয়ম ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে অন্যকে জলে ডুবিয়া আগুনে পুড়িয়া অনশনে রোগযন্ত্রণায় মৃতপ্রায় দেখিয়া কখনও তাহাদের উদ্ধারের জন্য যত্ন করেন নাই। সাধনার ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলেও তাঁহারা যাহা করেন নাই তাহার ফল আর কি করিয়া প্রাপ্ত হইবেন ? যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কতকগুলি বাহ্যিক বেশভূষায় ও বাহিরের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া সাধককে পরোপকার জীবসেবা আদি ভগবৎকার্য্যসাধনে উৎসাহিত না করিবে, সে পর্য্যন্ত এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হওয়াই যে অস্বাভাবিক। যে সাধক পাথরের ভিতর দিয়া বিশ্বনাথকে ফুটাইয়া বাহির করিতে গিয়া জীবরূপী জীয়ন্ত বিশ্বনাথের বুকে ধাক্কা মারিয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে দ্বিধা বোধ না করে, সে পর্য্যন্ত সে আর কি করিয়া বিশ্বনাথকে দর্শন করিবে বিশ্বনাথের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইবে ! যে ব্যক্তি 'বিশ্বজীববিগ্রহঃ' বলিয়া ভগবানের স্তব করিয়াও জীবের সুখদুঃখে উদাসীন থাকিবে, এমন কি জীবের কষ্টের অকল্যাণের কারণ হইতে থাকিবে, তাহার পূজা আর কি করিয়া জগন্নাথ গ্রহণ করিবেন। যে পূজারী

যে সাধক মাটির পাথরের মন্দিরগুলি শুদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট হইয়াও জীবরূপী ভগবৎমন্দিরের ময়লা দূর করিতে জীবকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া তুলিতে চেষ্টা না করিবে তাহার দ্বারা মন্দিরের সেবা ঠাকুর-দেখা কি কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হয়? আমাদের যে এখন ধর্ম্ম রহিয়াছে শুধু কতকগুলি কথার পোষাকে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে। ধর্ম্মাঙ্গগুলি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই তবে আমরা ধর্ম্মসাধনার সুফল-লাভে আশা করিতে পারি। তোমার পাণ্ডা ঠাকুর তোমার নিকট ষোল আনা গ্রহণ করিয়া তোমার পিঠে 'তীর্থযাত্রা সফল' বলিয়া চাপড় মারিলেও সমস্ত যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবান তোমার এই কাজকে ভগবানে সর্ব্বস্ব দানরূপ ষোল আনা উৎসর্গরূপে গ্রহণ করিয়া তোমার সেই দানকে আপন নিবেদনরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। ভগবান অন্তর্যামী, তাঁহাকে ভুলাইয়া স্বার্থসিদ্ধি সহজ নহে। দোকানের সিদ্ধি খাইয়া সিদ্ধ বলিয়া মূর্খকে প্রতারণা করিতে পার, কিন্তু সে প্রবঞ্চনা জ্ঞানীকে জ্ঞানাধারকেও কি ভুলাইতে সমর্থ হইবে মনে কর? মনে রাখিতে হইবে ধর্ম্মবিভ্রাটই যাবতীয় কর্ম্মবিভ্রাটের হেতু, ইহারই ফলে ধর্ম্মের গতি আজ যেন আরও গহন বলিয়া মনে হইতেছে। এই যে সমস্ত বিচিত্রতার মধ্যে কর্ম্মফল-রহস্য পুনর্জন্ম-তত্ত্ব আস্বাদ করিবার সুযোগ পাও না, ইহার জন্য দায়ী তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি দায়ী তোমার নিজেরই কর্ম্মকাণ্ড। প্রকৃত সাধক হইয়া ভিতর-

বাহিরে বেশ একটা সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিয়া লইয়া ভগবানের দয়া ন্যায়পরতা সর্ব্বভূতে সমভাব সর্ব্বজীবে প্রেম অনুভব করিয়া জীবন সার্থক মনে কর, সমস্ত ভয়-ভাবনা হইতে রক্ষা পাইবে। যাঁহারা ভগবৎবিধান-তত্ত্বে কর্ম্মরহস্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারাই জগতের অনন্ত বিচিত্র পরিণতির মধ্যেও একটা বেশ সুন্দর সমঞ্জস্যের ভাব শ্রীভগবানের মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত দর্শন করিয়া অভয়-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, আনন্দ-সমাধিতে বিভোর হইয়া যান। আর যাঁহারা এ সব তত্ত্বের ধার ধারেন না, সিদ্ধ-মহাত্মাদের বাক্যে বিশ্বাস করেন না, সূক্ষ্মদৃষ্টিলাভে চেষ্টা করা দূরে থাকুক সূক্ষ্মদৃষ্টির সম্ভাবনাকেও অবিশ্বাস করিতে বসেন, তাঁহাদের পক্ষে জন্মান্তর-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা জানেন না বলিয়া নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন না, তাঁহারা কৃপার পাত্র; কিন্তু যাঁহারা না জানিয়া না বুঝিয়া না সাধন করিয়া কোনও তত্ত্বকে অস্বীকার করিতে বসেন, তাঁহাদের পক্ষে সাধুকৃপা বা ভগবৎকৃপা-লাভও যে কঠিন হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব কর্ম্মবাদ-রহস্য যেভাবে জগৎবৈচিত্র্যের মীমাংসা করিতে সমর্থ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর কোনও কারণ থাকে না।

শক্তির পরিণতি

জগতে কি আছে, আমাদের এই দেহের মধ্যে কি আছে এবং তাহাদের মধ্যে কতটা নিত্য কতটাই বা অনিত্য ; এবং সেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের কি সম্বন্ধ, নিত্যে কেন অনিত্য আরোপিত হয় কল্পিত হয়, এই কল্পনারই বা কারণ কি উদ্দেশ্য কি, এবং সেই উদ্দেশ্যই বা কি ভাবে কত দিনে পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, কি ভাবে কি তালে পরমাত্মার এই ব্যষ্টি-সমষ্টি দেহ লইয়া লীলা চলিতে থাকে তাহা নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। স্রষ্টার উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এ খেলার বিশ্রাম হইলে চলে কি না, চলা সম্ভবপর কি না তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই সব গুরুতর বিষয় লইয়া বিচার করিতে গিয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্ম-তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব জগৎতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব, এক কথায় নির্গুণ সগুণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে নির্গুণ তত্ত্বও যতটা ঠিক, সগুণ তত্ত্বও ততটা ঠিক। তাঁহাদের মতে সগুণ নির্গুণেরই মূর্ত্তি, নির্গুণ আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আপন মহিমা প্রচার করিবার জন্য যোগ-

মায়ার সাহায্যে সগুণ আকারে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া পড়িলেন। যিনি তুরীয়াবস্থায় গুণাতীত অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্বরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিই আবার আপন মহামায়ার সাহায্যে সগুণ ও অনন্ত হইলেন বহুরূপে প্রকাশ পাইলেন। তিনি যেন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন অনুস্যূত থাকিয়া বিচিত্র জীব-জগৎরূপ পোষাকের মধ্য দিয়া আপন লীলা-মাধুরী বিস্তার করিতে বসিলেন। একবার তিনি প্রকৃতির ভিতরে লুকাইলেন আবার তাহারই মধ্য দিয়া প্রকট হইয়া ধরা দিলেন। চোরাগ্রগণ্যের এই লুকোচুরি লইয়াই তো দার্শনিক পণ্ডিতসমূহের সৃষ্টি ও লয়-তত্ত্ব, সাধক-ভক্তগণের ভগবৎ-লীলারহস্য। আমাদের সকলের ভিতরেই তিনি লুকাইয়া এই লীলার অভিনয় করিতেছেন। সখা ভক্ত অর্জ্জুন তাঁহারই কৃপায় এই লীলার কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন—সাধারণ জীব সেই ভগবৎদত্ত দিব্যদৃষ্টির অভাবে এই লীলাতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ। সকলের ভিতরেই সেই সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ-ভাবে বর্ত্তমান, তবে তাঁহার প্রকাশ বিকাশ ও অনুভূতি সর্ব্বত্র সমান নহে। যাহার চিত্ত যত শুদ্ধ ও শান্ত তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ তত সহজে অনুভব-বেদ্য। স্বচ্ছ কাচেই তো প্রতিবিম্ব-দর্শন অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক। জীব-মাত্রেই এইভাবে শিবের মূর্ত্তি, জীবমাত্রেই এইভাবে আমাদের বিষ্ণু-ভগবানের অবতারবিশেষ। নিম্ন-শ্রেণীর অবতার হইতে সকলকেই একদিন পূর্ণাবতারে জীয়ন্ত ভগবৎ-

বিগ্রহে পরিণত পরিগণিত হইতে হইবে—অর্থাৎ আমাদের সকলের ভিতর দিয়াই তিনি একদিন অর্জ্জুনের সারথিরূপে, উদ্ধবের আরাধ্য দেবতারূপে,মা-যশোদার বাল-গোপালরূপে, ভক্তের ভগবানরূপে, শ্রীরাধার প্রাণ-গোবিন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাসনা সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সফল করিয়া দিবেন। আমাদের এই পূর্ণ পরিণতিলাভের আগে কিছুতেই বিশ্রাম করিবার উপায় নাই। সৃষ্টির সময়ে যে শর প্রণবধনু হইতে ছাড়া হইয়াছে তাহা ব্রহ্মভেদ না করিয়া কিছুতেই বিশ্রামলাভে সমর্থ নহে। জগতের সব জীবকেই যতদিনে হউক না কেন, তাহাদের স্বর্গীয় পিতার ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। এই পূর্ণতালাভের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই কাজের জন্য স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ জগতের যাহা কিছু কর্ম্ম বা ভোগের দরকার তাহার মধ্য দিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। খুব উন্নত আত্মা সূক্ষ্মভাব সূক্ষ্মকর্ম্ম লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন, সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্মভাবের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যাহাদের মন সূক্ষ্মভাব লইয়া লিপ্ত থাকিতে সূক্ষ্ম ভোগ লইয়া তৃপ্ত থাকিতে সূক্ষ্ম জগতের মধ্য দিয়া আপন পরিণতি সাধন করিয়া লইতে এখনও সেরূপ অভ্যস্ত নহে, তাহাদের পক্ষে দেহান্তে পুনরায় অপর স্থূলদেহ অবলম্বন করা যে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। শক্তির অনন্ত পরিণতিলাভের পূর্ব্বে বিশ্রাম নাই; তাই কোনও শক্তি

মাঝখানে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে দেখিলে তাহাকে বাহনচ্যুত মনে হইলে, তখন যে সে বাহনান্তরগ্রহণ করিয়া অন্য কোনও রাস্তা অবলম্বনে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ থাকা যুক্তিযুক্ত নহে,—তবে সেই বাহনটি সেই শক্তির অনুকূলভাবে স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক। যদি সূক্ষ্ম বাহন অবলম্বনে চলিতে আরম্ভ করে তবে আমরা সে বিষয়ে বিশেষ কিছু অনুভব করিতে বা জোর করিয়া কিছু বলিতে তত সহজে সমর্থ হই না, এমন কি বাহনটি স্থূল হইলেও সাদৃশ্য দেখিয়া অভিজ্ঞতার বলে শাস্ত্রপ্রমাণে যোগীদের সাহায্যে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি মাত্র। যে ব্যক্তি বৃন্দাবন যাইবে বলিয়া রওয়ানা হইয়াছে, বৃন্দাবনে না পৌঁছিলে যাহার বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, সে মাঝখানে কোনও ষ্টেশনে অদৃশ্য হইয়া পড়িলে তখন বুঝিতে হইবে যে সে অন্য গাড়ীতে বসিয়া একটু বিশ্রামান্তে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহাদের দর্শনশক্তি খুলিয়া গিয়াছে, যাঁহারা তাহার প্রকৃত স্বরূপ উপাধিগত বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, শুধু তাঁহারাই বলিতে পারেন সে এখন কোথায় কিভাবে চলিতেছে। আমাদের পূর্ণতালাভ যখন শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য, তখন যেভাবে যত দিনে হউক তিনি আমাদিগকে ঠিক তাঁহারই আদর্শে পূর্ণ না করিয়া তাঁহার আনন্দধামের প্রকৃত অধিকারী না করিয়া ছাড়িবেন না; সুতরাং আমরা আর মাঝখানে

অপূর্ণাবস্থায় কি করিয়া বিশ্রাম করিব ? আমাদের গতি—ভগবানের আকর্ষণ-শক্তি রোধ করে কার সাধ্য ? যে শক্তি দ্বারা তিনি আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে চালিত করিয়াছেন, গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার আগে পূর্ণতালাভের পূর্ব্বে তাহার যে আর ক্ষয় বা বিশ্রাম-লাভ অসম্ভব। শক্তির যদি বিশ্রামলাভ বলিয়া কোনও কথা থাকে তবে তাহা পূর্ণতালাভের পরে,—পাগলীর যদি নৃত্যের বিরাম দেখিতে সাধ থাকে, তবে তাহা শিবের বুকে শিবকে দেখিয়া শিবকে পাইয়া শিবকে লইয়া শিবময় হইয়া। তখন যে শক্তি শক্তিমানে লীন—তখন যে সবই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন; তখন না থাকে সৃষ্টি না থাকে লয়, না থাকে তুমি-আমি,—তখন যে থাকে অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য ভেদাভেদভাবাপন্ন ভেদাভেদ-বিবর্জ্জিত অখণ্ড অদ্বয়-তত্ত্ব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

যেমন আমার প্রকৃতিতে আমার স্বভাবে আর আমাতে বিশেষ কোনও ভেদভাব লক্ষিত হয়না, 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'—পুরুষমাত্রেই শ্রদ্ধাময় শ্রদ্ধার সমষ্টি শ্রদ্ধারই নামান্তর মাত্র, শ্রীভগবানও তেমনি তাঁহারই প্রকৃতির তাঁহার বিধানের সহিত অভেদভাবাপন্ন। বিধানগুলি যেন তাঁহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। যে ভাবের যে মূর্ত্তির ভিতর দিয়া তাঁহার বিধানের যত বেশী প্রকাশ, তাহারই মধ্যে আমরা তাঁহাকে ততটা বেশী করিয়া আস্বাদ করিবার সুযোগ পাই। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সাধক ভক্ত ও

প্রেমিকগণ তাঁহার বিধানের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রত্যক্ষ জীয়ন্ত সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এইজন্য আমরা জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার বিধানগুলিকে এমন অমোঘভাবে কাজ করিতে দেখি যে, বিধানের কর্ত্তাকে না মানিয়া না স্বীকার করিয়া তাঁহার দিকে না চাহিয়া শুধু বিধানগুলি জানিয়া মানিয়া পালন করিয়া চলিলেও আমরা সাধক ভক্ত ও প্রেমিকের গম্যস্থানে গিয়া পৌঁছিতে পারি। তাই তো সাধকদের মধ্যে একদল বিধানের দিকে বদ্ধদৃষ্টি, আর একদল বিধাতার জন্য পাগল! বিধান ও বিধানকর্ত্তার মধ্যে যখন কোনও ভেদ নাই তখন আমরা এই উভয় দলের যাত্রীকেই সাধক বলিয়া পূজা করিব ভক্তি করিব অনুকরণ করিব। তাঁহার বিধানগুলি আমাদের নিকট প্রকাশ পায় কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাব বা রূপের মধ্য দিয়া,—যাহা সূক্ষ্ম ভাবরূপে অবস্থিত ছিল তাহাই আমাদের ভঙ্গি ভাব বা বাক্যের মধ্য দিয়া স্থূলরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। উপনিষদ সচ্চিদানন্দের ক্রিয়াশক্তিকেও তাঁহারই স্বভাব বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অগ্নির স্বভাব যেমন তাপ দেওয়া আলোর স্বভাব যেমন প্রকাশ করা, ভগবানের স্বভাবও তেমনি তাঁহার সত্তাকে সন্ধিনী, চৈতন্যকে সম্বিৎ ও আনন্দকে হ্লাদিনী শক্তিরূপে পঞ্চকোষের ভিতর দিয়া ব্যষ্টি-সমষ্টি জীবদেহ অবলম্বনে ফুটাইয়া বাহির করা। বেদ ভগবানের এই ক্রিয়াকে ছন্দরূপে বিজ্ঞান স্পন্দনরূপে মীমাংসা

কর্ম্ম যা যজ্ঞরূপে দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপে ভক্ত ভগবল্লীলারূপে রসতত্ত্বরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দেবতা-তত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব সাধনতত্ত্ব প্রণবতত্ত্ব জন্মান্তর-তত্ত্ব এই স্পন্দনেরই নামান্তর মাত্র। বিজ্ঞান শক্তির সাতত্যের শক্তির নিত্যত্বের মধ্য দিয়া এই স্পন্দন-তত্ত্ব কর্ম্মতত্ত্ব ও জন্মমৃত্যু-তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরচিত্ত-বিজ্ঞান দূর-দর্শন দূর-শ্রবণ, বিনা তারে শব্দ-স্পর্শ-রূপের প্রেরণ আদি এই ছন্দতত্ত্বের বা কর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত। কর্ম্মকে কেবল স্থূলে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার এখন আর কোন উপায় নাই—মনে কামভাব-পোষণও যে ব্যভিচারেরই অন্তর্গত। গীতায়ও তাই কথিত হইয়াছে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া মনে মনে বিষয়চিন্তা দ্বারাও মানুষ মিথ্যাচারী বলিয়া অভিহিত হয়। জীবের সুখদুঃখ-ভোগ আপন আপন কর্ম্মের উপর নির্ভর করে—মানুষ যে বাস্তবিকই স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরে, যেমন কাজ করে তদনুরূপ ফল ভোগ করে (As a man soweth so he reapeth.)। জীবের সমস্ত কর্ম্মগুলিই নাকি চিত্রগুপ্তের খাতায় এমন ভাবে লিখিত রহিয়া যায় যে, তাহার ফলভোগ একান্তভাবে অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; তাহার হিসাবে ভুল নাই তাহাকে ফাঁকি দিবার যো নাই। যতদিন কর্ম্মফলভোগ শেষ না হইবে ততদিন বিশ্রাম নাই, তাহাতে যত বৎসর যত জন্ম লাগুক না কেন; 'নাভুক্তং

ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি', 'ভোগাদেব ক্ষয়োঽস্য নির্দ্দিষ্টঃ'—ভোগ না করিয়া তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার আর কোন উপায় নাই; এমন কি, মানুষ এই দেহ ছাড়িয়া গেলেও কর্ম্মফলভোগের হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। ভগবানের রাজ্যে তুমি যেখানেই যাওনা কেন, চিত্রগুপ্তের খাতাখানি সেখানে গিয়া তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিবে। তাইতো মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১৮১১৬) দেখিতে পাই—'যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস তাহার আপন মাতাকে চিনিয়া লয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করে'। "যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং। তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমুপগচ্ছিত॥" এইজন্য জন্মান্তরবাদ লইয়া বিচার করিবার সময় কর্ম্মতত্ত্ব কর্ম্মফল-ভোগরহস্য আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রাচীন শাস্ত্রে কর্ম্মের তিনটি অবস্থার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি; ইহার উপরকার তুরীয়া-বস্থা যে বর্ণনার, এমন কি অনুভবেরও অনধিগম্য। ব্রহ্ম পূর্ণাবতার নাকি এই তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্মধামে গোলোকে কৈলাসে অবস্থান করিয়া উদাসীন গুণাতীত ভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সগুণ চিত্রগুপ্তের খাতায় নাকি তাঁহার কোনও কার্য্য-কলাপের উল্লেখ করার উপায় নাই। জীবের আদর্শ সেইভাবে অবস্থান করা, সেইরূপ অসংস্পৃষ্টভাবে কর্ম্ম করা; তবে এইরূপ কর্ত্তা জগতে দুর্লভ। আমরা সাধারণতঃ যে সব কর্ম্ম ও

কর্ত্তা দেখিতে পাই, তাহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে— শুক্ল, শুক্ল-কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। ইহাদেরও আবার স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণভাবে চেষ্টা কামনা ও ইচ্ছারূপে অবস্থান এবং কার্য্যকলাপের বিষয়ও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের প্রথমে বহু হইতে ইচ্ছা হইল— ইহা কারণ-ভাবগত; তার পরে তিনি সৃষ্টিবিষয়ে তপস্যা করিলেন বিচার করিলেন চিন্তা করিলেন, সর্ব্বশেষে সেই বাসনা চেষ্টারূপে কর্ম্মরূপে পরিণতি লাভ করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরিণত করিয়া বিবর্ত্তিত করিয়া বসিল। জীবের কর্ম্মের মধ্যেও আমরা এই ত্রিবিধভাব দেখিতে পাই। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, সুতরাং কর্ম্মপ্রবাহও অনাদি। বহুদিন পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে প্রাক্তন প্রাক্‌ভব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম বলে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব-জন্মের অস্তিত্ব অর্থাৎ জন্মান্তর-বাদ হিন্দুদের মজ্জাগত তত্ত্ব-বিশেষ। এই অভুক্ত প্রাক্তন কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্মও বলে 'অনেকজন্মসঞ্জাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্'; বর্ত্তমান সময়ে যে কর্ম্ম করা হইতেছে তাহাকে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলে 'ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে'। সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হয়, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিতে হয় 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা'। এই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মনাশ সাধারণ জীবের পক্ষে অদৃশ্য ও অনধিগম্য, সুতরাং উহাদের পক্ষে ভোগ দ্বারাই কর্ম্মক্ষয়

সুসঙ্গত। একজন্মে আর কতগুলি কর্ম্ম ক্ষয় করা যায়? তাই সাধারণ জীবের মরণকালে অনেক কর্ম্মই বাকী থাকিয়া যায়। সেইগুলি ভোগ করিবার জন্য ঋষিগণ অনেকের পক্ষেই পুনর্জন্ম-গ্রহণের আবশ্যকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। এমন লোক খুব কমই দেখা যায় যাহাদের অবশিষ্ট কর্ম্মগুলি শুধু সূক্ষ্মজগতে সূক্ষ্মভাবে অনুষ্ঠান বা ভোগের যোগ্য। সুতরাং সেই সব সাধারণ লোকের পক্ষে ভোগায়তন স্থূলদেহ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম শেষ করিবার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। এইজন্য দেহত্যাগের সময় একজাতীয় স্বরূপানুকূল-গুণবিশিষ্ট কতকগুলি কর্ম্ম—যাহা একদেহে ভোগসাধ্য—একত্র হইয়া একটা তদ্ভাবের ভাবনাময় সূক্ষ্মদেহ উৎপন্ন করে। পুনরায় মর্ত্তলোকে প্রবেশের সময় সেই সব সংগৃহীত কর্ম্মের সংস্কার লইয়া তাহার ভোগের অনুকূল দেশকাল-পাত্রে সে জন্মগ্রহণ করে। এই প্রারব্ধ কর্ম্ম এই নূতন দেহে ভোগ করা হয়। সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যেগুলি এই নূতন জন্মে নূতন দেহে ভোগ করিতে হইবে তাহাকেই প্রাক্তন বা প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। এই কর্ম্মগুলি যতদিন ভোগ দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত না হইবে ততদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার ক্ষয়ে দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সঞ্চিত কর্ম্মের যে অংশ এই নবজন্মে ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাই প্রারব্ধ। ভগবান পতঞ্জলি "ততস্তৎস্বরূপানুকূলগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাং" এই সূত্রে সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে কোন্‌গুলি এজন্মে ভোগ

করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরের সূত্রে জাতি ও দেশকালের ব্যবহিত সংস্কারগুলির আনন্তর্য্যও দেখান হইয়াছে। এজন্মে ও আগামী জন্মের মধ্যে বহু দেশ জাতি ও সময় ব্যবধান থাকিলেও তাহাদের অনুকূল ভাবগুলি কি ভাবে স্তরে স্তরে সবদিকের সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া সাজান হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন যে, স্মৃতি ও সংস্কারকে কেন একজাতীয় বলা হয়—কেন এই স্মৃতি ও সংস্কারগুলি একই ভাবে চিত্ত-ভূমিতে সংরক্ষিত হয়। বহু পূর্ব্বজন্মের যে সব সংস্কার অজ্ঞাতসারে চিত্তভূমিতে অঙ্কিত রহিয়াছে এবং বর্ত্তমান জন্মে যে সব সংস্কার উৎপন্ন হইতেছে, তাহারা আপনা হইতে সাদৃশ্যানুসারে চিত্তভূমিতে সংরক্ষিত ও সুসজ্জিত হইয়া থাকে। যোগিগণ সাধকগণ চিত্তের এই সব সংস্কার সাক্ষাৎকার করেন বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক জন্মের বিবরণ অবগত হইতে পারেন। ভগবান বুদ্ধ শঙ্কর ও চৈতন্য তাঁহাদের বহুজন্মের বিবরণ স্থানবিশেষে লোকবিশেষের নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ত্রি-তত্ত্ব

সব ধর্ম্মেই ত্রিমূর্ত্তি-তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক আগন্তুক ভাবগুলি একটু সরাইয়া ধরিয়া প্রকৃত তত্ত্বের দিকে চাহিয়া দেখিলে উহার মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়-তত্ত্বের আভাস বেশ সুন্দরভাবে লক্ষ্য হয়। ভগবান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপে তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের ভিতরে অনুপ্রবেশ করিয়া অনুস্যূত থাকিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ পরিবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপন লীলামাধুরী বিস্তার করিতেছেন। আত্মার নিত্যত্ব এবং প্রকৃতি-দেহের ষড়্‌বিধ বিকারভাব এই লীলারসই বিস্তার করিয়া থাকে। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার ভিতরে কোন আত্মা লুকাইয়া থাকিয়া 'জায়তে-অস্তি-বর্দ্ধতে-বিপরিণমতে-অপক্ষীয়তে-নশ্যতি' এই ষড়্‌বিধ বিকারভাবের মধ্য দিয়া আপনার নিত্যত্ব অবিকৃতভাব ফুটাইয়া বাহির না করে। প্রকৃতি যখন যে লীলার ভিতর দিয়া পরম পুরুষের সেবা করিতে থাকেন, তখন সেই অবস্থায় সমষ্টিপ্রকৃতির তালের সঙ্গে আপন তাল মিলাইয়া পরম পুরুষের সেবার সহায় হওয়া

আত্মার বিকাশের প্রকাশের লীলার সাহায্য করাই জীবাত্মার ধর্ম্ম বা সাধনা। ব্যষ্টি সমষ্টির তালে চলিলে সমষ্টি ব্যষ্টিকে নিজের সঙ্গে লইয়া চলিতে পারিলে আর বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। তবে মনে রাখিতে হইবে অসতী যেমন সতীর গৌরব প্রকাশ করে, দুঃখ যেমন সুখকে অবাধিতভাবে ফুটাইয়া বাহির করিয়া আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার সাহায্য করে, বিরোধ-বিরহভাবও তেমনি মিলনকে মধুরতর করিয়া তোলে। সগুণ নির্গুণের সাকার নিরাকারের সসীম অসীমের কিভাবে প্রকাশের লীলার সহায় হয়, দ্বন্দ্ব-তত্ত্বের মূল রহস্যটি উপকারিতাটা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে সে তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা কঠিন।

ঋষিরা বলেন—যে দ্বন্দ্বাতীত তত্ত্বে পৌঁছিয়া স্বরূপ সাক্ষাৎ-কার করিয়াছে, সে-ই নাকি যাবতীয় দ্বন্দ্বের ভিতরে দ্বন্দ্বাতীত ও উদাসীনভাবে অবস্থান করিয়া মা-কালীর সমস্ত তাণ্ডব নৃত্যের ভিতর দিয়া শিবতত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে শিবতত্ত্বে অবস্থিত থাকিতে সক্ষম হয়। একবার আসল তত্ত্বটি বুঝিয়া লইতে পারিলে একবার স্বরূপটি জানিয়া লইলে তারপরে আর লীলাখেলায় বিচলিত হইতে হয় না। যে-দড়িকে সর্প বলিয়া কল্পনা করিয়া অশান্তির অভিনয় করিতে বসিয়াছি, সেই সর্পরূপী দড়িতে রজ্জুত্ব আরোপ করিয়া প্রকৃত পক্ষে সে যে রজ্জুই ইহা বুঝিয়া লইয়া কল্পিত শোকমোহের হাত হইতে রক্ষা পাওয়াই সমস্ত সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য। এইজন্য আমরা

স্বরূপ ভুলিয়া মায়ায় মোহিত হইয়া যে অসার কল্পনাজল্পনা লইয়া একটা বৃথা ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, সেই অসার দুঃখ-কষ্ট-ভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ, এমন কি না বুঝিয়াও প্রকৃত স্বরূপতত্ত্বের লীলাতত্ত্বের অভিনয় করিতে আমাদিগকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই অভিনয়-চেষ্টার নামই তো উপাসনা; প্রতীকোপাসনাদি ইহার নামান্তর মাত্র। যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকে দ্রব্যবিশেষে স্থানবিশেষে ব্যক্তিবিশেষে আরোপ করিয়া, সমস্ত যন্ত্রের অধীশ্বরকে আমাদের কল্পিত যন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃরূপে বরণ করিয়া, আমাদের অন্তর্যামীকে অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমাদের ভিতরকার অকর্ত্তার কর্তৃত্বে আমাদের সমস্ত আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, যাহা হইতেছে যাহা অতিক্রম করিবার কাহারও শক্তি নাই তাহাকে হইতে দেওয়ার চেষ্টা করা, তাহা কি ভাবে হইয়া যাইতেছে সে তত্ত্ব বুঝিয়া লওয়াই আমাদের প্রকৃত সাধনা।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন—ব্রহ্মার এই সৃষ্টি-কার্য্যের সহায় হইতে হইবে। তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য কিরূপ অবাধিত-ভাবে চলিয়া যাইতেছে এই তত্ত্ব আস্বাদ করাই ব্রহ্মার প্রকৃত উপাসনা। বিষ্ণু-শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তিনি কি ভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া তাঁহার স্থিতিকার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন, সেই তত্ত্ব অনুভব করা সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সেই তত্ত্বে আপন আপন তত্ত্ব মিলাইয়া

চলা—কি ভাবে মিলিয়া চলিতেছে সেই তত্ত্ব আস্বাদ করাই যে বিষ্ণু-ভগবানের প্রকৃত উপাসনা। শিব-ভগবান্ সমস্ত অশিবকে বিনাশ করিয়া অশিবকে সার্থক করিয়া বিনাশের ভিতর দিয়া মৃত্যুর ভিতর দিয়া কি ভাবে নূতন জীবনের প্রকৃত পরিণতির পরিশেষে স্বরূপপ্রতিষ্ঠার সহায় হইতেছেন, এই তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা শিবোপাসনার গূঢ়রহস্য বুঝিতে পাই। আমাদের ভিতরে প্রতিমুহূর্ত্তে এই তিন দেবতার লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে। সমস্ত দিনের মধ্যে এই ত্রিমূর্ত্তির কার্য্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যই তো হিন্দুগণ গায়ত্রী আদি সাধনার ভিতর দিয়া ত্রিমূর্ত্তি-তত্ত্ব এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রভাতে ব্রহ্মার ক্রিয়া সৃষ্টির কাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব গোষ্ঠ-লীলা অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। দুপুর বেলা বিষ্ণু ভগবানের স্থিতি-লীলাটা কর্ম্ম-অকর্ম্মের সমন্বয় ভাবটা বেশ যেন সুন্দরভাবে আস্বাদ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলা আমরা আবার শিব-মহারাজের লয়তত্ত্বের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের উত্তর-গোষ্ঠলীলার সাহায্যে আমাদের সমস্ত সংসারের খেলা ছুড়িয়া ফেলিয়া মার কোলে ঘুমাইয়া পড়িবার সুযোগ পাই। আবার পর দিন সেই খেলার সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আবশ্যক-বোধে সামান্য একটু পরিবর্ত্তনের নূতন ভাবের মধ্য দিয়া আমরা যেন বেশ সুন্দর আর একটী নূতন খেলা নূতন ভাবে করিবার সুযোগ পাইয়া

থাকি। আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যেও আমরা এই ত্রিতত্ত্বের লীলা দেখিয়া মোহিত হইয়া যাই। জীবনের প্রথম ভাগটা যেন সৃষ্টির অনুকূল 'জয়তে-অস্তি-বর্দ্ধতে'র মধ্য দিয়া আমরা পূর্ণ পরিণতির যোগ্য হইয়া উঠি। আমাদের জীবনের বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই সৃষ্টির লীলা ব্রহ্মার খেলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এই সময় আমরা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মার উপাসক। এই সময় যাহাতে আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক অবয়ব ও বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মার কাজে সহায় হওয়া, আমাদের ভিতর দিয়া ব্রহ্মা যে কিভাবে তাঁহার সৃষ্টির এই আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় দিতেছেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সেই তত্ত্বের তালে তালে চলিয়া যথাসম্ভব আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমানের ঠিক অনুপাত অনুসারে তাঁহার কাজের সহায় হওয়াই তখন আমাদের সাধনা। এসময় গ্রহণ ও বর্জ্জনের ভিতর দিয়া পোষণতত্ত্বের চরিতার্থতালাভে বাধা দিতে গিয়া আমরা যে অনেক সময় কিভাবে ভগবৎইচ্ছা-পূরণে বাধা দিয়া আমাদের পাপের বোঝা ভারী করিয়া তুলি, তাহা আমরা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিনা।

কালিদাস যৌবনে 'বিষয়ৈষিণাম্' বিষয়ভোগের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিতে কেন যে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত! এই বত্রিশ-বৎসর

পর্য্যন্ত প্রকৃতির বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্য দিয়া শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের প্রতি স্পন্দনের সাহায্যে আমাদের ভিতর-বাহিরের সূক্ষ্ম-স্থুল দেহের সমস্ত পরিণতিগুলিকে পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার পরে বত্রিশ হইতে চৌষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত আমরা হইব বিষ্ণু-ভগবানের উপাসক। তখন আমাদের যেন কতকটা স্থিতির সময়। স্থিতিতত্ত্বে কিভাবে বিষ্ণু-ভগবান তাঁহার জগতের পরিপালন-কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া যাইতেছেন, সেই তত্ত্ব আস্বাদ করিয়া আমাদিগকে যেভাবে যতটুকু তাঁহার কাযের ভার গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ আমাদের ভিতর দিয়া তিনি যেভাবে যে লীলার অভিনয় করাইয়া লইতে চান কিংবা আমাদিগকে তিনি সৃষ্টিকার্য্যের যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের সেই উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার ইচ্ছাপূরণের আমাদের যাবতীয় বৃত্তিস্ফুরণের সম্পূর্ণভাবে সহায় হইতে পারিলেই আমাদের বিষ্ণুপূজা সার্থক হইবে। এইজন্য এই বয়সে বিবিধ আন্দোলনের ভিতর দিয়া বিষ্ণু-ভগবানের জগৎরক্ষণ-কার্য্যে সহায় হইবার জন্য সমস্ত দেশের প্রধান প্রধান মনুষ্য-গণকে বিশেষভাবে সচেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে আমাদের লয়তত্ত্বের অভিনয় করিবার পালা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা হইয়া পড়ি শিবতত্ত্বের উপাসক। আমাদের দেহযন্ত্রটি আপনা হইতেই প্রাকৃতিক বিধান

অনুসারে বিকৃত হইয়া যাইতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চেষ্টা করে; এই অবস্থায় কোন মতে তালি দিয়া কাজ চালানো আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে কাযের জন্য এই দেহটি সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই কার্য্য যেন এখন অনেকটা সমাধা হইয়া গিয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যাহাতে ভগবৎবিধান অনুসারে আমরা কার্য্যান্তরে মনো-নিবেশ করিবার সুযোগ পাই, এই দেহে যাবতীয় অস্বাভাবিক ভাবের আসক্তিগুলি ত্যাগ করিয়া যাহাতে লয়ের ভিতর দিয়া আমরা আর একবার আমাদের প্রকৃত স্বরূপটি বুঝিয়া লইতে সক্ষম হই, মৃত্যুর ভিতর দিয়া গিয়া অমৃত-তত্ত্বের আস্বাদ লাভ করিয়া আমাদের নূতন জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিবার সুযোগ পাই, তাহার চেষ্টা করাই এই অবস্থার এই যুগের সাধনা। গড়ার আনন্দের ন্যায় ভাঙ্গার ভিতরও যে একটা সুন্দর আনন্দ লুকাইয়া আছে, সে তত্ত্ব এই সময় আস্বাদ করিতে হয়। একবার দাঁত উঠিবার বেদনার মধ্য দিয়া আমরা দাঁতগুলিকে পূর্ণভাবে আনন্দের সহায় করিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলাম, এখন আবার তাহার কার্য্যাবসানে তাহা হইতে বিদায় লইয়া তাহার প্রতি তাহার সম্বন্ধে অনাসক্ত হইবার সময় আসিয়াছে। সমষ্টি প্রকৃতি-দেবীর পঞ্চভূতের নিকট হইতে কতকগুলি উপাদান ধার করিয়া যে দেহটি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার কার্য্যাবসানে

প্রকৃতিকে নিজ হাতে সজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দের সহিত সমস্ত উপাদানগুলি সমর্পণ করিয়া দিতে পারিলেই আবার আবশ্যক বোধে প্রকৃতি দেবী হইতে আমাদের পক্ষে অনুকূল উপাদানগুলি লাভ করিবার সুবিধা জুটিবে। এই লয়-তত্ত্বকে মধুর করিয়া তুলিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ বানপ্রস্থাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। এই বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্মগুলি কর্ত্তব্যগুলি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে কিভাবে যে শেষে সুন্দররূপে আনন্দের সহিত দেহত্যাগে সামর্থ্য ও সুযোগ লাভ করা যায়, তাহা আমরা বেশ সুন্দর বুঝিতে পারি। এইজন্য আমাদের এই জীবননাট্যের শেষ অভিনয়ে আমরা লয়-যোগকে শূন্যবাদকে গৌরবময় মহিমাময় আনন্দময় করিয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করি। প্রাচীন ঋষিগণ শূন্যের মূলে একত্বের অদ্বয়তত্ত্বের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা এই লয়ক্রিয়ার ভিতর দিয়া যে প্রকৃত পক্ষে কতগুলি তত্ত্ব লীন হইয়া যায় আর কতগুলি তত্ত্ব লীন হইতে বাকী থাকে; এবং যেগুলি বাকী থাকে সেগুলি যে আবার কিভাবে কতগুলি নূতন তত্ত্বের নূতন উপাদানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নূতন লীলারস বিস্তার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, সেই তত্ত্বের ভিতর দিয়া তাঁহারা জন্মান্তর-তত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আত্মাকে অজর অমর বলিতে গেলে যে তাহার সৃষ্টিতত্ত্ব বা লয়তত্ত্ব মানা

চলেনা, এই তত্ত্ব তাঁহারা বেশ সুন্দরভাবে অনুভব করিয়া গিয়াছিলেন। যাহা উৎপত্তিশীল তাহা যে বিনাশশীল হইতে বাধ্য, তাহা আমাদের না মানিলে চলেনা। যাঁহারা প্রকাশের বিকাশের অভিব্যক্তির তারতম্য দেখিয়া আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ-তত্ত্বের কল্পনা করিতে বসেন, তাঁহারা যে প্রকৃত সার তত্ত্বের অতি অল্পাংশই সন্দর্শন করিয়াছেন,তাহাতে আমাদের বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্ম আদি জোর করিয়া জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করিতে গিয়া নিত্য আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিতে গিয়া সসীম পাপ-পুণ্যের ফলে অসীম অনন্তকালের জন্য স্বর্গ-নরকভোগের কাল্পনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক দার্শনিক-গণের নিকট যে কিভাবে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা একটু সামান্য চেষ্টাতেই বুঝিতে পারা যায়। হিন্দু ঋষিদের মতে শুধু যে আত্মা অনাদি তাহা নহে, সৃষ্টিপ্রবাহও বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি। আত্মা দেহবর্জ্জিত হইয়াও দেহের মধ্য দিয়া আপন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। একবার ব্যষ্টি-ভাবে জীবদেহ অবলম্বনে ও সমষ্টিভাবে জগৎদেহ অবলম্বনে জগতের ভিতরে লুকাইয়া পড়েন, আবার তাহার ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে প্রকাশ পাইয়া আপন স্বরূপ ফুটাইয়া বাহির করিয়া আপন লীলারস প্রচার করিতে বসেন। ভগবানের এই লীলা অনাদিকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনন্তকাল

পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। একএক ভাবের এক-একটি লীলা ফুটাইয়া বাহির করিবার পরিণত করিবার জন্য আত্মা এক-একটি দেহ গ্রহণ করেন। তাহার ভিতর দিয়া যতটা বিকাশ পাওয়া লীলা করা সম্ভবপর তাহা পূর্ণ হইয়া গেলে তদপেক্ষা সমধিক পরিণতির অনুকূল আর একটি দেহ অবলম্বনে তখন তাঁহার লীলা আরম্ভ হইয়া থাকে। পূর্ণ পরিণতির পূর্ব্বে নাকি এ খেলার বিরাম নাই, তাই হিন্দুগণ এতটা জন্মান্তরবাদী। দিনগত ত্রিমূর্ত্তির লীলা যেমন পর দিনের লীলার সহায় হয়, আমাদের বর্ত্তমান জন্মের লীলাগুলি বর্ত্তমান জন্মের ভিতর দিয়া ত্রিমূর্ত্তির লীলাতত্ত্বও সেইরূপ আগামী জন্মের লীলার সহায় হইয়া থাকে।

প্রাচীন ঋষিগণ ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বিচারের মধ্য দিয়া অতি সুন্দরভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন, ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে ভগবানের এই লীলাস্বীকৃত বিগ্রহ জীবদেহ ও জগৎদেহ কিভাবে ভগবৎলীলার সহায় হয়। তাহার ভিতর কতকগুলি স্তর কতকটা যেন পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া তাঁহারই প্রকৃতির তালে তালে নাচিয়া তাঁহার লীলারসকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। সৃষ্টিতত্ত্বকে তাঁহারা যেমন স্থূলে সীমাবদ্ধ করেন নাই, লয়-তত্ত্বকেও তাঁহারা তেমনি কেবল স্থূলে সীমাবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন নাই। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণতত্ত্ব পঞ্চকোষতত্ত্ব ভূর্ভুবঃস্বঃ

আদি সপ্তলোক সেই বিভিন্ন স্তরগুলির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আমাদের স্থূলদেহের মৃত্যুতে যে শুধু বাহিরের একটা স্থূল আবরণমাত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়; এই স্থূল আবরণের মৃত্যুর ভিতর দিয়া তদপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ কিভাবে স্থূলদেহান্তর গ্রহণ করিয়া আপন পরিণতি সাধন করিয়া লয় তাহাতো আমরা বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাই। সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের পূর্ণ পরিণতি যে কোথায় গিয়া শেষ হয়, তাহারও প্রকৃত স্বরূপ দেখান হইয়াছে; সেই পরিণতি যে সাধারণ জীবের পক্ষে বর্ত্তমান জীবনে লাভ করা অসম্ভব, এ দেহত্যাগের পরেও যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিণতির অনেকখানি বাকী থাকিয়া যায়, সেই পূর্ণ পরিণতিলাভের পূর্ব্বে যে সূক্ষ্ম-দেহের লীলার বিরাম নাই—সূক্ষ্মদেহের পক্ষে স্থূল-দেহের সাহায্য যে বিশেষভাবে আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহাও বেশ সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ আগম-বাদী হইলেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে কখনও অগ্রাহ্য করেন নাই—যদিও তাহাদের সীমানির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা কখনও ভুলিয়া যান নাই। যাহা অতীন্দ্রিয় তাহাকে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে বা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে; তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণ পরিণতি লাভ করিলে তাহারা কতদূর শক্তিমান হইয়া পড়ে, তাহা সাধারণ জীবের ধারণার অতীত।

সুন্দরভাবে কর্ষিত অনুশীলিত ইন্দ্রিয়গুলি যে সূক্ষ্মানুভূতির অনেক বেশী পরিমাণে সহায় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে যে তত্ত্ব মনেরও অতীত, সেই তত্ত্বকে কল্পনা দ্বারা প্রচার করিতে তাঁহারা বৃথা প্রয়াস পান নাই। জন্মান্তরবাদ সূক্ষ্মতত্ত্বের অন্তর্গত, অনেক পরিমাণে সাধনবেদ্য; সেজন্য সাধনাদ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ সাধকগণ সেই তত্ত্ব যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন দিব্য চোখে দর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা শাস্ত্রের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উপযুক্ত সাধনাও করিবনা ঋষিদের কথায়ও বিশ্বাস করিবনা, এইরূপ মনের ভাব লইয়া জন্মান্তর-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা একটু কঠিন হইয়া পড়ে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

জগৎসৃষ্টি বলিয়া কিছু থাকুক বা না থাকুক, তাহার মধ্যে যে একটা পরিবর্ত্তন পরিণতি বা বিবর্ত্তন চলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; এই পরিণতি পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনের মধ্যে যে একটা নিয়ম একটা তাল একটা বিধান চলিতেছে তাহাও নিঃসন্দেহ। ইহার একটা অবস্থাকে অপরিণত আর একটাকে পরিণত বলিলে কোনও দোষ হয় না। বীজ আগে কি গাছ আগে তাহা লইয়া যতই গোলমাল চলুক না বা যতই গবেষণা হইতে থাকুক না কেন, বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি-বৃদ্ধি-পরিণতি ও ক্ষয় এবং সেই নানা ক্রিয়ার মধ্যে যে একটা ক্রম একটা তাল একটা বিধান পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎটা পারমার্থিকভাবে মায়া ছায়া শূন্য শশশৃঙ্গ খ-পুষ্প বা রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যা বা বিবর্ত্তন—যাহা কিছু হউক না কেন, ব্যবহারিক জীবের নিকট তাহার একটা ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করা যায় না। শঙ্কর আদি অদ্বৈত-বাদীও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের কথা এই, ব্যবহারিক সত্তা লইয়া—যাহা কিছু দেখি শুনি অনুভব করি

তাহা লইয়া,—সৎকার্য্যবাদী সৎকারণবাদী আরম্ভবাদের খণ্ডন করিতে গিয়াই পরিণতি বা বিবর্ত্তন-তত্ত্বের মধ্য দিয়াও এক রকম আরম্ভবাদেরই প্রকৃত রহস্য ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ, সেই পরিণতি বা বিবর্ত্তনেরও একটা উৎপত্তি ও শেষ ধরিয়া লইতে হইয়াছে; বলা বাহুল্য, তাহাও যে একজাতীয় সৃষ্টি ও লয়। ব্যষ্টি-সমষ্টি প্রায় একতালেই চলিতেছে। নদীর সমস্ত জলের গতি আর তাহার প্রতি পরমাণুর গতি প্রায় একভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জলের পরমাণুর সমষ্টিই নদী এবং নদীর জলের অংশগুলিই তাহার বিভিন্ন পরমাণু। জগৎ-সৃষ্টি পরিণতি বিবর্ত্তনাদি যে তালে অনুষ্ঠিত হয়, জগতের প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টি পরিণতি বা বিবর্ত্তনও যে প্রায় ঠিক সেই তালেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারকে ঋষি-গণ সাধকগণ ভগবানের লুকোচুরি-খেলার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বত্র জড় ও চৈতন্যের খেলা বেশ সুন্দরভাবে অনুমিত হইয়া থাকে। উভয়েরই একটা পরিণতি বা বিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। আসলে উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ থাকুক বা না থাকুক, উভয়ের কতকটা পুরুষ-প্রকৃতিরূপে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের ন্যায় যুগলরূপে লীলা করিতে বসিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জড়টা যেন বাহন (Medium) আর চৈতন্যটা শক্তিটা যেন তাহার দেবতা! বিজ্ঞান ও দর্শন যথাক্রমে এই ভূত ও শক্তির তত্ত্ব লইয়া সদা

ধ্যানমগ্ন! যোগিগণ যেন বাহনতত্ত্ব অবলম্বনে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে দেবতার জ্যোতি প্রত্যক্ষ করিয়া পরমপুরুষে পরমাত্মায় গিয়া লীন থাকিতে ভালবাসেন। জ্ঞানী যেন প্রতিতত্ত্বে প্রকৃতি-পুরুষের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতিকে পুরুষে লীন করিয়া অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ অদ্বয়তত্ত্ব আবিষ্কারে তৎপর। তন্ত্রশাস্ত্র যেন ইহার মধ্যে পুরুষকে অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় জানিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া জগৎকে সগুণের খেলা মনে করিয়া সগুণ ব্রহ্মকে প্রকৃতি-পুরুষের কতকটা যুগলরূপকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছেন। ভক্তগণ বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাধকগণ প্রকৃতির প্রতিতত্ত্বে তাই উত্তমপুরুষের রাসবিহারী রসিক-শেখরের অধিষ্ঠান লীলা বিহার দেখিয়া ভগবানের সেই মধুর লীলার সহায় হইতে ভগবানের সেই রাসরসের পরমানন্দ-মাধুর্য্য আস্বাদনে বিভোর হইয়া যাইতেছেন। আসল কথা, ভূতের ভিতর দিয়া শক্তির লীলা প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পুরুষ-চৈতন্যের লুকোচুরিখেলা। একবার যেন লুকাইতেছেন, একবার যেন ফুটিয়া বাহির হইয়া ধরা দিতেছেন। বাল-গোপালের রসিকশেখরের মা আনন্দময়ীর এ লীলাই নাকি স্বভাব! স্বভাবের অভাব হয় না, তাই এ লীলা আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণ অনেক বিচার করিয়া এই তত্ত্বকে বীজা-

স্কুরবৎ অনাদি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই অনাদি তত্ত্বের আবিষ্কার জ্ঞানের অভাব হেতু নহে, ইহা জ্ঞানের পূর্ণতা প্রকাশ করে। পাশ্চাত্য দর্শনের সহজাত সংস্কারের (Instinct) ন্যায় ইহা অক্ষমতাকে ঢাকিয়া রাখিয়া অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে না। প্রকৃতপক্ষে যাহার আদি নাই তাহার আদি কল্পনা করিতে যাওয়া, বর্ণনা করিতে যাওয়া, প্রচার করিতে বৃথা চেষ্টা পাওয়াই যে ধৃষ্টতা মাত্র। ব্যাস-বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও আচার্য্য শঙ্কর মায়াকে সৃষ্টিপ্রবাহকে কেন যে অনাদি বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ভিতরকার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া একেবারে মূল কারণের কাছে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, মূল কারণকে কেন অনাদি বলা হয়। যাহা সাধনবেদ্য তাহাকে কল্পনাজল্পনা দ্বারা আর কতটা অনুভব করা যাইবে? যাহা বাক্য-মনের অগোচর, মন আর তাহা কি ভাবে প্রকাশ করিবে? মনস্তত্ত্বের উপরে যাহা অবস্থিত তাহাকে মন প্রকাশ করিতে পারিল না বলিয়া অস্বীকার করিতে যাওয়া যে প্রকারান্তরে নাস্তিকতা বিশেষ।

এখন দেখা যাউক ভূত ও শক্তিতত্ত্ব হইতে দেবতা ও বাহনতত্ত্ব হইতে সাধকগণ কোন্ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যদর্শন ভূততত্ত্ব বাহনতত্ত্ব লইয়া একটু বেশী ব্যস্ত, আর প্রাচ্য সাধকগণ

শক্তিতত্ত্ব দেবতাতত্ত্ব লইয়া ধ্যানমগ্ন সমাধিরস-আস্বাদনে বিভোর। আমরা ইহার কোনটাই অস্বীকার করি না। উভয়ের অস্তিত্ব অনেকটা সমানভাবে স্বীকার করিয়া উভয়ের একটা অদ্ভুত সমন্বয়ের ভিতর দিয়া আমরা কতকটা তত্ত্বাতীত নিরঞ্জনের কাছে গিয়া পৌঁছিতে চেষ্টা করি। সর্ব্বত্র ক্রম-বিকাশতত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জড়ের চোখ দিয়া দেখিয়া জড়ভাবে ভাবিত মতি লইয়া বিচার করিয়া সর্ব্বত্র জড়ত্বের বিকাশতত্ত্ব প্রচার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, মাঝখানে হঠাৎ চৈতন্যের আবির্ভাব দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া তাঁহারা জড়বুদ্ধির সাহায্যে জড় ও চৈতন্যের মহিমা ঘোষণা করিতে গিয়া মাঝে মাঝে একটু ভুল করিয়া বসিয়াছেন। যাহার মধ্যে জড় ও চৈতন্য এই দুইটী তত্ত্ব রহিয়াছে, একটির সাহায্যে তাহা আর কি করিয়া পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যাইবে? আর একদল আবার কতকটা জড়কে বাদ দিয়া কেবল চৈতন্যতত্ত্ব প্রকাশ করিতে, সমস্ত জড়চৈতন্যাত্মক তত্ত্বকে চৈতন্যের সাহায্যে প্রচার করিতে গিয়া অনেকটা ফাঁপরে পড়িয়াছেন; প্রাচ্য সাধকগণ কিন্তু জগতের এই যুগল-লীলার ভিতরে উভয়ের অস্তিত্ব সমানভাবে স্বীকার করিয়া প্রতি তত্ত্বে উভয়কে সমানভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া আস্বাদ করিয়া অপার আনন্দরসে বিভোর হইয়াছেন। আমাদের দেশে যাঁহারা শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞানে ভূষিত কিংবা যাঁহারা পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে

প্রাচ্য শাস্ত্র পড়িয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাপরিভাবিত মনে শাস্ত্রের বিচার করিয়া ভারতের শাস্ত্ররহস্য সাধনরহস্য হৃদয়-ঙ্গম করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাও সময় সময় বেশ একটু গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে ভারত স্বীকার করিয়াছেন উভয়-তত্ত্ব—ভূত ও শক্তি, বাহন ও দেবতা; কাহাকেও অস্বীকার করিতে অনাদর করিতে ভারতের কৃতজ্ঞ সাধকগণ কখনও প্রস্তুত হন নাই। তাই আমরা ভূতের পরি-ণতি বা বিবর্ত্তনের সঙ্গে শক্তির পরিণতি বা বিবর্ত্তন-তত্ত্বকে মানিয়া লইয়াছি। ভূতের ভিতর দিয়া কি ভাবে শক্তিতত্ত্ব ফুটিয়া বাহির হয়, বাহনতত্ত্ব দেবতাতত্ত্বকে কি ভাবে প্রকাশ করে প্রচার করে, ইহা লইয়াই ভারতের কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিপ্রধান সাধকগণ সর্ব্বদা সাধনারত। ভূত বা বাহনের মধ্য দিয়া দেবতাতত্ত্বের, ভূতনাথের সামান্য আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পূর্ণবিকাশ পূর্ণভাবে লীলাতত্ত্বের আবিষ্কারে আস্বাদনে সাধকগণের এত যত্ন। বিজ্ঞানের বাহনতত্ত্বের (Medium) সঙ্গে ইহাদের আবিষ্কার ও অনুভূতির পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তাপ আলোক শব্দ তাড়িত আদি সমস্ত কম্পনের গতির জন্য বিজ্ঞান এক-একটা বাহনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যেখানে বিশেষ কিছু বলিবার মত খুঁজিয়া পান নাই, সেখানে একটা অজ্ঞাত ইথার তত্ত্বের (আকাশ)

সাহায্যে আপনাদের অজ্ঞতাকে একটু চাপা দিয়া বাহনতত্ত্বের সর্ব্বত্র আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই বাহনতত্ত্বের ভিন্নতা ও স্বরূপ কতকটা আমাদের দেহ-তত্ত্বের স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণশরীরের অনুরূপ। সমস্ত জগৎই যে আসলে সেই এক মূল শক্তিরই লীলাখেলা বা বিভূতি। একই মূল তত্ত্ব আমাদের মা আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী অনন্ত জীবজগৎরূপে দেহী-দেহরূপে আপনাকে বিভক্ত করিয়া 'ছিন্নমস্তা' তত্ত্বের ভিতর দিয়া আপন লীলামাধুরী বিস্তার করিতে বসিয়াছেন। শক্তির বিভিন্ন ভাবের বিকাশের জন্য বিভিন্ন রকমের বাহন দরকার। তাই তো এক-এক দেবতার এক-এক শক্তির ভিন্ন-ভিন্ন রকমের বাহনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। শিব যেন যোগমায়ার সাহায্যে প্রকৃতির ভিতরে ডুব দিলেন লুকাইয়া গেলেন, আবার ধরা দিবার ছলে টু-দেওয়ার ভিতর দিয়া বিভিন্ন জীবতত্ত্বরূপে বাহনবিশেষের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া পূর্ণ বিকাশের পূর্ণ পরিণতির দিকে ছুটিলেন। জীবকে পূর্ণ-ভাবে পরিণত করিয়া সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্যে পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়া জীবকে তাহার স্বরূপে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে আর যেন শিবের নিস্তার নাই শিবের বিশ্রাম নাই। এইভাবে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার জন্য জীবকে অনেকজাতীয় বাহনের, শক্তিকে অনেকগুলি

ভূতের মধ্য দিয়া গিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হয়। এই বাহনতত্ত্বই দেহ; এবং দেবতাতত্ত্ব জীবাত্মার বিকাশ। এই বিকাশ আবির্ভাব পূর্ণতাপ্রাপ্তি বেশ সুন্দর একটা তালে তালে নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রাচীন ঋষিগণ জন্মান্তর-রহস্যের মধ্য দিয়া সেই তত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কর্ম্মবাদ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ভাবের মধ্য দিয়া সেই তত্ত্বের মহিমাই ঘোষণা করিয়া থাকে। যাঁহাদের সাধনবলে চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হওয়ার ফলে সেই সূক্ষ্ম দর্শন খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা দিব্য চোখে সেই তত্ত্ব সন্দর্শন করেন, দিব্যতত্ত্বে আনন্দলোকে বসিয়া সেই তত্ত্ব আস্বাদ করেন। নিম্নস্তরের লোকেরা আপন আপন শিক্ষা-দীক্ষার অনুসারে সেই তত্ত্বের খণ্ডন-মণ্ডন ব্যাপার লইয়া অযথা বাদবিচারে লিপ্ত থাকিয়া কাকের ন্যায় পক্ব বিল্বের আস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন।

...বাস্তবিকই উপনিষদ্ যেন জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ড—বেদের সার; উপনিষদ্ আর বেদ ভগবানের চিদ্‌বিভূতি। তুমি যে সূত্রটির উল্লেখ করিয়াছ, তাহা হইতে বাস্তবিকই পুনর্জন্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি গূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। প্রথমতঃ মনে কর 'কামময় এবায়ং পুরুষঃ'—আমরা যে সত্য সত্যই কতকগুলি কামনা বাসনা সংস্কারের সমষ্টি। গীতার 'শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' শ্লোকটি স্মরণ কর। জগৎটা শ্রীভগবানের বহু হইবার বাসনার স্ফুরণ বা মূর্ত্তি মাত্র; 'একোঽহং বহুধা ভবামি' আমি এক—বহু হইব, এই তাঁহার বাসনা বা ইচ্ছাই তিনি কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্য দিয়া জগজ্জীবরূপে ফুটাইয়া বাহির করিয়াছেন। সৃষ্টি দেখিয়া আমরা স্রষ্টাকে, স্রষ্টার মনোভাবকে, স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে বেশ সুন্দরভাবে ধরিয়া ফেলিতে পারি। সৃষ্টিটা যে হইয়াছে তাঁহার আত্মপ্রকাশের জন্য। স্রষ্টার এই কামনা যেমন সৃষ্টির জগতের ভগবৎবিগ্রহের জন্মের কারণ, আমাদের মনের কামনা-বাসনাও ঠিক সেইরূপ

আমাদের ভবিষ্যৎ জন্মের কারণ হইয়া পড়ে। "কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র" মুণ্ডকের এই শ্রুতিটি স্মরণ কর; কামনা হেতু বাসনার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তার ফলে জীব সেই কামনা যেখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে, যেখানে গেলে যেখানে জন্মিলে জীবের সূক্ষ্ম কামনা স্থূল দেহ ধারণ দ্বারা পূর্ণরূপে সফল হইতে পারিবে এমন স্থানে গিয়া সে জন্ম লাভ করে। জীব অমৃতের সন্তান 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', তথাপি সে লীলাচ্ছলে দেহরূপ উপাধি গ্রহণ করিয়া সংসারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আসিয়া থাকে। এই অভিনয় করিতে তাহার যে কত জন্ম লাগিয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। এজন্মে তাহার কথা ভাব ও কাজ দ্বারা সে যেরূপ ভাবনাময় দেহ লাভ করিয়াছে অর্থাৎ যে ভাবের কামনা তাহার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে, সে পরজন্মে ভাবী জন্মে সেই কামনাভোগের উপযুক্ত জমিতে গিয়া জন্ম-গ্রহণ করিবে। "স ঈয়তে হমৃতো যত্র কামম্" (বৃহ ৪।৩।১২)। ভগবান বুদ্ধ এই কামনাকে কামকে 'তন্হা'কে তৃষ্ণাকে বধ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে কামনাই মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মূল কারণ, কামনা হইতে সৃষ্টির আর যত কিছু দোষ উৎপন্ন হয়। গীতায় শ্রীভগবানও এই দুরাসদ দুর্জ্জয় কামকে দমন করিতে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং

দুরাসদম্”। কামনার পরিণাম সংস্পর্শজ সুখ হইতে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ যোগীর আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সুখ যে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ না থাকিলেও, আমরা কিন্তু জগৎকে আনন্দময়েরই বিলাসবিভূতি জানিয়া জনকাদি রাজর্ষির দিকে চাহিয়া এই জগৎকেই সুখময় করিয়া তুলিতে সচেষ্ট।

প্রথমতঃ বুঝিতে পারা গেল কামনা জন্মগ্রহণের কারণ। তার পরে এখন দেখা যাউক—“স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি” (বৃহ ৪।৪।৫) জীব যেরূপ কামনা করে যেরূপ কামনাময় যচ্ছ্রদ্ধ হইয়া পড়ে, তদনুসারে সে চিন্তা করে। কারণে যাহা থাকিবে তাহাই তো সূক্ষ্মের সর্ব্বশেষে স্থূলের মধ্য দিয়া কার্য্যরূপে প্রকাশলাভ করিবে। কারণ-দেহের কামনা সূক্ষ্মদেহে ভাবনারূপে আবির্ভূত হইয়া সূক্ষ্ম-দেহকে তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া যে কিভাবে পরজন্মের কারণ হয়, আমরা তাহার পরিচয় ছান্দোগ্যেও দেখিতে পাই। “অথ খলু ক্রতুময় এব পুরুষঃ। যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি” (৩।১৪।১)। জীব শ্রদ্ধাময় জীব ক্রতুময়, সূক্ষ্ম চিন্তা দ্বারা এমন ভাবে ভাবিত যে সেই চিন্তা ছাড়া তাহার যেন আর কোনও পৃথক অস্তিত্ব অনুমান করাও কঠিন হইয়া পড়ে। এই লোকে যে যেরূপ-ক্রতু হইবে যেরূপ ভাবনা লইয়া থাকিবে,

দেহান্তে সে তদ্রূপ হইবে সেইরূপ দেহ লাভ করিবে। যে ব্যক্তি যেরূপ তীব্র সংস্কার তীব্র ভাবনা লইয়া দেহ ত্যাগ করিবে, সেই ভাবনার অনুকূল ভূমিতে যেখানে সেইজাতীয় ভাবনা পরম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবে এমন দেশ-কাল-জাতিতে সে জন্মলাভ করিবে। তার পরে ভাবিয়া দেখ "যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে। যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে" জীব যেজাতীয় ভাবনা লইয়া থাকে তাহার ঠিক অনুকূলভাবে কাজ করে, অর্থাৎ ভাবনাগুলি তদনুকূল ভাবে কাজের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। ইহার পরের কথা, জীব যেরূপ কর্ম্ম করে ঠিক সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।

কেহ কেহ বলিতে ইচ্ছা করেন যে, এই শ্রুতিটি পুনর্জন্মের ততটা পোষক নহে। ইহা ভিতরের কামনা বাসনা কি ভাবে বাহিরে কার্য্যের ভিতর দিয়া অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া বাহির হয়, ভিতর-বাহিরে কেমন সুন্দর একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া থাকে; এবং মৃত জীব পরলোকে গিয়া কিভাবে বাস করে, তাহারও সুন্দর আভাস প্রদান করে। কিন্তু এই শ্রুতি যখন পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বেশ সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা যায়, এই উপনিষদেই অন্যত্র যখন পুনর্জন্মের পোষক অপর অনেক শ্রুতি দেখা যায়, অপর অনেক উপনিষদও যখন পূর্ণভাবে

পুনর্জন্ম-তত্ত্বকে সমর্থন করে—সমস্ত ভাষ্যকারই যখন এই সব শ্রুতিগুলিকে পুনর্জন্মপর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন—আর সেই পুনর্জন্ম-তত্ত্ব যখন হিন্দুধর্ম্মের একটা মজ্জাগত সত্য, তখন জোর করিয়া অন্য ভাবের কথা বলিলে তাহা কি করিয়া মানিতে পারা যায়? ভগবান পতঞ্জলিও তো এইভাবেই পুনর্জন্ম-তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। "সতি মূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (২।১৩) এ জন্মে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিপাকই পরজন্মের জাতি আয়ু ও ভোগ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এজন্মে আমরা যেরূপ কর্ম্ম করিব, তাহারই ফল আমাদের পরজন্মের সুখ-দুঃখের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে। এজন্মে আমি যাহার অনিষ্ট করিয়াছি, পরজন্মে সে আমার অনিষ্ট করিবে; এজন্মে আমি যাহার সাহায্য করিয়াছি, পরজন্মে সে আমার সাহায্য করিবে। আমার এজন্মের কর্ম্ম দেখিয়া আমি পরজন্মে কোন্ বংশে কিরূপ ঘরে জন্ম গ্রহণ করিব, কিভাবে কত পরিমাণে সুখ-দুঃখ ভোগ করিব, কত দিন জীবিত থাকিব ইত্যাদি বিষয় প্রকৃত সাধক যোগী এখনও বলিয়া দিতে সক্ষম।

বহুদিন পূর্ব্বে একজন মহাত্মা দেখিয়াছিলাম, যিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জন্মের কার্য্যপ্রণালী ইহজন্মেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। এমন ভাবে তিনি জীবনের

অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেন, যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়া যাইতে পারে। তিনি বলিতেন "এজীবনের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে ; এখন যতদিন জীবিত থাকিব, ভবিষ্যৎ জীবনটা যাহাতে মঙ্গলময় আনন্দময় করিয়া তোলা যায়, সেজন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকিতে হইবে"। কেহ যদি তাঁহাকে বলিত "আপনার আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না—আর আপনাকে সংসারের জেলখানায় আসিতে হইবে না"। তখন তিনি খুব জোরের সহিত বলিয়া ফেলিতেন—"আমি নিশ্চয়ই আবার আসিব—এই ভারতে আসিব, ভারতমাতার দুঃখ দূর করিয়া তাঁহাকে আবার সেই প্রাচীন গৌরবে ভূষিত না দেখিয়া আমার মুক্তিলাভ অসম্ভব। আমার এই দেহের প্রতি পরমাণু প্রত্যেক রক্তবিন্দু, আমার প্রত্যেক কামনা বাসনা সংস্কার ও আমার সমস্ত সাধন-ভজনের জন্য আমি ভারতমাতার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ঋণশোধ না হইলে মুক্তি অসম্ভব! আমি এজীবনে সেই ঋণশোধের উপযুক্ত কিছুই করিয়া যাইতে পারি নাই। তাই ভগবৎবিধান মতেই আমাকে আবার আবশ্যক হইলে অসংখ্য বার এই ভারতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তবে তখন আসিব কয়েদী ভাবে নয়—জেইলার ভাবে ; বদ্ধ-পুরুষের ন্যায় নহে—মুক্ত-পুরুষের মত ; ভারতবাসীকে মুক্তির পথ আনন্দের পথ

ভগবৎধামের পথ দেখাইবার জন্য। আমার সে জীবনে আমি ভগবৎইচ্ছা এমনভাবে পূর্ণ করিব যে, কোনও কামনা বাসনা সংস্কার তখন আর আমাকে ভগবৎইচ্ছা-পূরণে বাধা দিতে পারিবে না।" তাঁহার একান্ত বিশ্বাস কবীর, তুলসী দাস, রামদাস, শিবাজী, গুরু নানক, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাম-মোহন ও বিজয়কৃষ্ণ আদি সব মহাত্মাগণ ভারতের কল্যাণের জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। তাঁহার কথা ও ভাব লইয়া চিন্তা করিলে মনে হয়, ভারতে আবার সে সুদিন নিশ্চয়ই আসিবে। আজকার এই পতিত ভারতবাসীর পদ-তলে বসিয়া সেইদিন এই উন্নত পাশ্চাত্য জাতি ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সাধনার সার রহস্য ভগবানের বিচিত্র লীলাতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

সৃষ্টির অনাদিত্ব

…'জগতের সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে আমার আদি নাই' একথার মানে কি? এই যে আমি—ইহা শরীর কি আত্মা, কিংবা এই উভয়ের সম্বন্ধ-জনিত তত্ত্ববিশেষ? আমি যে শরীর নই, তাহা বোধ হয় স্বীকার করিবেন। আমি আত্মা হইলে তাহার অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, যাহা সাদি তাহা অনন্ত হইতে পারে না। আত্মাকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। এখন আমি যদি এই উভয়ের সম্বন্ধ-জনিত তত্ত্ববিশেষ হই, তবে সে সম্বন্ধ এই দেহের দিক্ দিয়া নিশ্চয়ই সাদি ও সান্ত। সেই ভাবের আমিকে অনাদি অনন্ত বলাই ভুল।…যে জিনিস অনাদি অনন্ত তাহার ক্রম থাকিবে না কেন? ক্রমটা তো বিকাশের তারতম্য—স্বরূপ নহে। এই অনাদি আত্মার দেহবিশেষ অবলম্বনকে আমরা জন্ম বলি এবং ঐ দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে প্রবেশকে আমরা পুনর্জন্ম বলি। বহু দেহের মধ্য দিয়া আত্মবিকাশের যেমন একটা ক্রম আছে, একই দেহের মধ্য দিয়া আত্ম-বিকাশেরও তেমনি একটা ক্রম দেখিতে পাই। বাল্য

যৌবনাদি বিভিন্ন অবস্থাপ্রাপ্তিই এই ক্রমের অন্তর্গত। আমরা আদি খুঁজিয়া পাইনা অন্ত খুঁজিয়া পাইনা বলিয়াই তো তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্টিপ্রবাহকে অনাদি অনন্ত বলি, খুঁজিতে গিয়া মাঝখানে আমার আমিটা যেন হারাইয়া ফেলি! জগৎসৃষ্টি সাদি ও সান্ত হইলেও সৃষ্টিপ্রবাহ উঠানামা কারণ-কার্য্যের উদয় ও লয়ের খেলাকে সাদি ও সান্ত বলা চলে না। আমার তো মনে হয় প্রকৃতিও অনাদি পুরুষও অনাদি, ইহাদের লীলাখেলাও চলিতেছে অনাদিকাল হইতে; এই লীলাখেলাই যে লীলাময়ের স্বভাব। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি হইলেও প্রকৃতির পরিণতির অহংতত্ত্বের বিকাশের তো একটা তাল আছে। 'বীজাঙ্কুর'-ন্যায়ের মধ্যেও যে 'জায়তে-অস্তি-বর্দ্ধতে' আদি পরিণামগুলি বেশ একটা তালে তালেই নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে। সেই তালেরই অবস্থাবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি আদি কথা বলা হয়। আমাদের জীবনগতির যে মস্ত একটা ক্রম আছে। আত্মা যেন প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরগুলি ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে বসিয়াছেন—রজস্তমের পরিণতি-বিশেষের কাছে গিয়া অহংতত্ত্ব ফুটিয়া বাহির হইল, সাত্ত্বিক পরিণতিতে তাহা পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়া পরিণামে কতকটা গুণাতীত অবস্থায় গিয়া সেই অহংকার আত্ম-নিবেদনে সার্থকতা লাভ করিল। আত্মার এই পূর্ণতার

স্বরূপপ্রতিষ্ঠার দিকে গতির একটা ক্রম আছে, চতুরশীতি লক্ষ যোনিভ্রমণ সেই ক্রমের অন্তর্গত। অবিরত লীলা-ময়ের লীলা চলিতেছে, ইহার আদি-অন্ত সাধারণের পক্ষে অজ্ঞাত; তাহারা মাঝখানের কাজটা মাত্র দেখিতে পায়, বাকীটা দর্শন করা দিব্য দৃষ্টিসাপেক্ষ।

অভুক্ত কর্ম্মফল ভোগের জন্য জীবের পুনর্জন্মগ্রহণ অপরিহার্য্য ; তাই পুনর্জন্ম-তত্ত্বের সহিত কর্ম্মবাদের ঘনিষ্ঠ যোগ। কিন্তু এই জন্য জীবের ভগবৎকৃপালাভে কোনও বাধা নাই ; কারণ, কর্ম্মবাদ ও কৃপাবাদ আসলে একই কথা। কর্ম্মটা কার আর তাহার সঙ্গে ভগবানের ভগবৎইচ্ছার কি সম্বন্ধ, ইহা বুঝিয়া লইতে পারিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। তবে সব গোল মিটান তোমার রসিকশেখরের ইচ্ছা নয়, তাই রসটাকে একটু সুন্দরভাবে মধুরভাবে আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য তিনি একটু লুকোচুরির অভিনয় করেন। হার-জিতটা খেলার সার পদার্থ নয়, খেলার উদ্দেশ্য আনন্দ করা ; হার-জিতের প্রলোভনটা মাঝ-খানে জেগে উঠে খেলাকে মধুরভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে—এর ভাবটা আগেও থাকে না, পরেও অন্ততঃ জ্ঞানীর কাছে থাকা উচিত নয়। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি,—মা আনন্দময়ী দেবী ভগবতী ; তিনি কে ? না, শ্রীভগবানেরই আপনা শক্তি। তিনি তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই আনন্দবৃদ্ধির জন্য তাঁহারই লীলারসবিস্তারের জন্য তাঁহা হইতে একটু পৃথক হওয়ায়

ভাণ করিয়া লীলাঅভিনয়টা সম্ভবপর ও মধুরতর করিয়া তোলেন। আসলে কি তিনি পৃথক হন—না হতে পারেন? পুরুষ হতে প্রকৃতির পৃথক অস্তিত্ব বর্ণনার অতীত ধারণার অতীত কল্পনার অতীত। ওটা হইতেছে যোগমায়ার ইন্দ্রজাল অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াবিভূতি। রজ্জুকে রজ্জু রাখিয়া মাঝখানে তিনি একটা সর্পত্বের অভিনয় করিয়া বসেন, অ-পৃথককে অ-পৃথক রাখিয়া একটা পৃথকত্বের ভিতর দিয়া লীলারস বিস্তার করেন। প্রকৃতির এই ক্রিয়াকলাপের দিক দিয়া বিজ্ঞান-দর্শন আবিষ্কার করেন কর্ম্মবাদ, আর পুরুষের উত্তম পুরুষের আনন্দ-রস বিস্তারের লীলাভিনয়ের মধ্য দিয়া সাধক ভক্ত বুঝিয়া লন কৃপাবাদ। বিজ্ঞান-দর্শনের কর্ম্মবাদই সাধক ভক্ত রসিকের নিকট কৃপাবাদ। পরমহংস-দেবের ভাষায় বলিতে গেলে বিজ্ঞান-দর্শন পুরুষ মানুষ বলিয়া বাহিরে থাকে বাহির হইতে দেখে, আর ভক্তি মেয়ে মানুষ বলিয়া মার অন্দরমহলে মা-বাবার আনন্দমহলে প্রবেশ করে, তাই ভক্ত জ্ঞানীর কর্ম্মবাদের প্রতিসূত্রে প্রতিস্পন্দনে শ্রীভগবানের হাত দেখিয়া কৃপা অনুভব করিয়া নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে আনন্দরসে বিভোর হইয়া যান। বড় বড় মহাত্মাদের মৃত্যু দেখিয়া গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের বিভ্রাটের সময় জ্ঞানী ভাবিয়া অস্থির হইলেও সাধক প্রেমিক ভক্ত এই সমস্ত অভিনয়ের পিছনে তাঁহার প্রেমময়ের মঙ্গলময়ের হাত দেখিয়া নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আনন্দে

বাস করিতেন। সমস্ত আন্দোলনের দেবাসুর-সংগ্রামের তাণ্ডব-নৃত্যের মূলে মায়ের পদতলে শিবকে অবস্থিত দেখিয়া সাধক সাধারণ লোকের ন্যায় সহজে বিচলিত হন না। যত ভেদ যত গোলযোগ তাহা কেবল আমাদের বুদ্ধিদোষে। আসল তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি থাকিলে আমরা ভগবৎলীলার সহায়ক ভাবে পুরুষত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে যথাসম্ভব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার মধ্যে অসঙ্গ উদাসীন অকর্ত্তৃভাবে সমরসে মগ্ন ও ভাবিত হইয়া পূত আনন্দরস আস্বাদ করিবার সুযোগ পাই। গীতা ঠিকই বলিয়াছেন, জীব আদির দিকে দৃষ্টি করে না অন্তের দিকেও তাকাইয়া দেখে না—মাঝখানটা লইয়া একটু হাসি-কান্নার অভিনয় করে মাত্র। তাই এই মাঝখানে বসিয়া তাঁহারই কর্ম্মরহস্য লইয়া যখন জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক অহঙ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি একটু আনন্দের হাসি হাসেন; আবার যখন তাঁহারা কোনও মতে তাঁহার একটু কাছে গিয়া তাঁহার লীলাবিভূতি দর্শন করিয়া মাঝখানে একটু বৃথা অহঙ্কারের অভিনয় করিবার জন্য লজ্জায় মাথা নত করেন, তখনও তিনি একটু আনন্দের হাসি হাসিয়া ছেলেকে তাঁহার অভয় কোলে টানিয়া লইয়া তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানরত্নে প্রেমমাধুর্য্যে বিভূষিত করিয়া দেন। সমস্ত গোলমাল বাদানুবাদ তখন শান্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের চোখে যাহা কর্ম্মবাদ, প্রেমের চোখে তাহাই কৃপাবাদ।

এ সম্বন্ধে আমরা দুই-একটা বাহিরের কথা লইয়া

একটু আলোচনা করিব। গীতা উপনিষদাদি-গ্রন্থে দেখিতে পাই পুরুষ অসঙ্গ, প্রকৃতিই সব করেন; তাহাও করেন পুরুষেরই আনন্দ-বৃদ্ধির জন্য। 'অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ'। মহামুনি পাণিনি কিন্তু এই অসঙ্গ পুরুষটিকে এত সহজে অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত নহেন, 'স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা' এই সূত্রটি তাহার সাক্ষী। তাঁহার মতে প্রকৃতি অহঙ্কার আদি তত্ত্ব শুধু গৌণ কর্ত্তামাত্র। "তৎযথা অমাত্যানাং রাজ্ঞঃ সমবায়ে পারতন্ত্র্যং ব্যবায়ে স্বাতন্ত্র্যমিতি।" ইহারা পুরুষ হইতে দূরে গেলেই একটু কর্ত্তৃত্ব জাহির করে, কিন্তু রাজার কাছে গেলে তাহাদের সে কর্ত্তৃত্বাভিমান লোপ পায়। গীতায়ও আমরা এই তত্ত্বই দেখিতে পাই। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ'—প্রকৃতিই তাহার গুণের সাহায্যে সব করেন বলিয়া পুরুষতত্ত্ব উত্তমপুরুষ-তত্ত্ব বর্ণনার পরে উত্তম পুরুষকেই আবার 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী' আদি বলিয়া মুখ্যকর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতি যে তাঁহারই প্রকৃতি—তাঁহারই কর্ম্মসাধনে নিযুক্ত, ইহা মনে রাখিলেই সব গোলমাল চুকিয়া যায়। গৌণকর্ত্তা মাঝখান থেকে জেগে ওঠে—কখন্ কেন? অহংতত্ত্ব প্রকৃতিরই একটা স্তর একটা পরিণতি-বিশেষ, তাহার আবির্ভাব প্রকৃতিকে ফুটাইয়া বাহির করিবার জন্য, তাহার সার্থকতা আত্মনিবেদনে। দুষ্টু ছেলেটা মা-বাপ হইতে যে একটু দূরে গিয়াছিল তাহা তারই অনুমতি-ক্রমে—একটু বাৎসল্য-রস পুষ্টির জন্য, ভবিষ্যতে মাকে

একটু বেশী করিয়া গাঢ়ভাবে পাইবার জন্য আস্বাদ করিবার জন্য। এই মা হইতে দূরে গিয়া মা হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিয়া যাহা সে কর্ম্মবাদরূপে বুঝিয়া লইয়াছিল, প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, মার কোলে গিয়া তাহাকেই সে আবার কৃপাবাদরূপে অনুভব করিতে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। মাঝে সে ভাবিয়াছিল কি স্বাধীনভাবেই না ছুটিয়াছি, সমস্ত জলরাশিকে কর্ম্মচক্রকে আমিই বুঝি চালাইয়া লইয়া যাইতেছি ; আর মার কাছে গিয়া দেখিল মার প্রেম-সমুদ্রে বাণ ডকিয়াছে জোয়ার খেসিয়াছে, তাই জলরাশি নদী অভিমুখে ছুটিয়াছিল ; আর যেই মা কাছে ডাকিলেন ভাঁটা ফেলিলেন, আর সেই সব জল মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। মার কাছে না গেলে এতত্ত্ব এরহস্য বুঝিবার উপায় নাই। তাই তো একটু দূরে বসিয়া যে জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক এতদিন কর্ম্মবাদ-রহস্য প্রচার করিতেছিলেন, তিনিই আবার মার একটু কাছে গিয়া আনন্দে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিয়া ফেলিলেন 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবি ঘরে, ডাকিতে এসেছি তাই চল ত্বরা করে' ; মাতৃভক্ত ছেলে এখানে শুধু মার আদেশ-পালনেই নিযুক্ত, তাঁর যে সাধনবলে ভগবৎকৃপায় অহং-তত্ত্ব বৃথা অভিমান লোপ পাইয়া গিয়াছে। আর একজন সাধক বলিয়া ফেলিলেন—'পুতুল-বাজীর পুতুল মোরা যেমন নাচায় তেমনি নাচি' ; বলা বাহুল্য তিনি আবার একটু ভক্তির আব্দার দেখাইতে গিয়া বলিয়া বসিলেন 'ভক্তির

জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী'। এখানে 'ভক্তির জোরে' কথাটি কি মধুর লীলাভাবের প্রকাশক! একে বলে নিরহঙ্কারীর অহংকার—যাহা দ্বারা জগতে তিনি তাঁহার মহিমা প্রচার করিবার সুযোগ পান। অপর একজন ভক্ত অহংতত্ত্বের সংস্কারটা দূর করিতে না পারিয়া মার ডাকে লজ্জিত হইয়া গান করিতে বসিলেন 'আমিতো জীবনে চাহি নি তোমারে তুমি অভাগারে চেয়েছ'। কবীন্দ্র রবীন্দ্র মার আদরে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া বলিয়া বসিলেন 'আমি নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে'। এসব ভাব অনেকটা মার অন্দর-মহলের কথা—বাহিরের লোকেরা ইহার মধ্যেও শুধু কর্ম্মফলবাদ দর্শন করিয়া থাকে। তাহারা বলে মা সব ছেলেকে ভিতরে যেতে দেন না কেন? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে অহংতত্ত্বের বিকাশের পূর্ব্বেও কর্ত্তৃত্বাভিমান ছিল না পরেও থাকিবে না। গীতাকার এই অহংবিকাশের আগের সম্বন্ধে অনাবশ্যক বোধে নীরব; অহং বিকাশ পাওয়ার পরে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে খুব উপদেশদানে প্রবৃত্ত, তবে তাহার মধ্য দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে প্রকৃতিই কর্ত্তা। তার পরে আবার প্রকৃতির স্বরূপ দেখাইয়া উত্তম পুরুষে সব কর্ত্তৃত্বের আরোপ করিয়া আত্মনিবেদনকেই সার তত্ত্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যেও আমরা কর্ম্মবাদই যে সাধকের নিকট কৃপাবাদরূপে অনুভূত

হয়, সে তত্ত্ব বেশ সুন্দরভাবে অনুভব করিবার সুযোগ পাই।

আমরা সর্ব্বদা প্রকৃতির এক অমোঘ বিধানই দেখিতে পাই, প্রকৃতিকে আমরা অচেতন ভাবিতে পারিনা। তিনি যে শ্রীভগবানের আদ্যাশক্তি, তাঁহারই ইচ্ছাপূরণে তাঁহারই প্রীতিসাধনে নিযুক্তা; তাঁহার ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দের সৎশক্তি চিৎশক্তি ও আনন্দশক্তি সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-রূপে প্রকাশ পাইতেছে—ইহারা একই শক্তির ত্রিবিধ বিকাশ বা একই তত্ত্বের ত্রিবিধ অনুভূতি। যাঁহারা সন্ধিনী শক্তি অর্থাৎ সতের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত, তাঁহারা কর্ম্মবাদের ভিতর দিয়া বিধানকর্ত্তার মহিমা উপলব্ধি করেন; যাঁহারা হ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ আনন্দের তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত, তাঁহারা প্রেমময়ের কৃপা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই প্রেমতত্ত্ব আস্বাদ করেন। একদল পরম বিধানের অমোঘতা দেখিয়া বিধান মতে চলিয়া বিধানের জোরে অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, আর একদল বিধাতার অমোঘ অব্যর্থ কৃপা স্মরণ করিয়া কৃপার সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাতে আত্মনিবেদন করিয়া সেই অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আনন্দানুভব করিতে থাকেন। ভগবৎবিধান কর্ম্মফল-তত্ত্ব অমোঘ—কারণ-কার্য্য-তত্ত্বের মধ্য দিয়া সে আপন স্বরূপ ফুটাইয়া বাহির করে। কর্ম্মফলবাদী 'নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি' বলিয়া যে কর্ম্মতত্ত্বকেই নমস্কার করেন, কৃপাবাদী

সেই কর্ম্মের ভিতরেও যিনি ইহার মূলে বসিয়া কারণের সঙ্গে কার্য্যের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয় সূর্য্য তাপ দেয় কারণ কার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভগবৎকৃপাবাদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়া চরম সার্থকতা লাভ করেন। আনন্দের ভিতর দিয়া যাহা প্রেমরূপে কৃপারূপে বর্ষিত হয়, তাহাই যে আবার সতের ভিতর দিয়া ভগবদ্-বিধানের ভিতর দিয়া কর্ম্মবাদরূপে আপন মহিমা বিস্তার করে, তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের নিকট তাহা অবিদিত থাকেনা। তারপরে প্রকৃতির সৃষ্টির কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য পুরুষকে প্রকাশ করা পুরুষকে ফুটাইয়া বাহির করা পুরুষের আনন্দানুভূতির সহায় হওয়া; এমন কি, তাঁহার আবরণ-তত্ত্বও তাঁহার প্রকাশ-তত্ত্বকে আস্বাদ্য ও মধুর করিয়া তুলিবার জন্য। অসুখ সুখকে প্রকাশ করে, বিরহ মিলনকে মধুর করে—পড়াটাও যে উঠিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। গোলাপ ফুলের ধর্ম্ম ফুটিয়া বাহির হওয়া, ইহার বাধাগুলি কেবল অকালে অপূর্ণভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে ইহাকে নিষেধ করে। প্রকৃতি চান তাঁহার স্বামীর প্রিয় জীবগুলিকে পূর্ণভাবে পরিণত করিয়া তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধির সহায় হইয়া ভগবৎইচ্ছা সফল করিয়া তুলিতে। এই যে পূর্ণতালাভের স্বরূপপ্রকাশের স্বরূপউপলব্ধির আত্মবিকাশের চেষ্টা, এইটি কম লাভ নহে,—কম কৃপার কথা নহে। আমাদের দেহের প্রতি

পরমাণু জগতের সব পদার্থ সব তত্ত্ব আমার এই দেহ পরিণত করিয়া তুলিতে বাঁচাইয়া রাখিতে—ইহার অভাবগুলি বাধাগুলি দূর করিয়া দিতে যে কিভাবে ব্যস্ত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বোধ হয় জীব অনেকগুলি ভাবনাচিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। বলিতে পার এই প্রকৃতিই ত আবার ধ্বংসের জন্য ব্যস্ত হন,—কিন্তু সেকাজে তিনি হাত দেন কখন? যখন জীবের এই দেহের কাজ শেষ হইয়া যায়, এই দেহের অন্য পরিণতির আবশ্যকতা বোধ হয়—তার পূর্ব্বে নহে। আমাদের মনপ্রাণ শান্ত করিতে উন্নত করিতে তিনি কত যত্নশীল, সাধক ছাড়া অন্যে তাহা সহজে বুঝিতে পারেনা। কাহাকেও জলে ফেলিয়া দিতে যত বাধা, জল হইতে তুলিতে তত বাধা নাই। আমরা যতই প্রকৃতির বিধান পালন করি, ততই মুক্তি লাভ করি স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম হই আনন্দের অধিকার লাভ করি; আর যত তাঁহার বিধান লঙ্ঘন করি, ততই স্বাধীনতা হারাই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি। ইহা হইতেও বোঝা উচিত যে তিনি চান আমাদিগকে মুক্ত করিতে মুক্ত দেখিতে আমাদের আনন্দের সহায় হইতে। তাঁহার এই ইচ্ছাই কৃপানামে পরিচিত; তবে এই কৃপারও একটা বিধান আছে ফল আছে, তাহাই কর্ম্মবাদরূপে বর্ণিত। তাঁহার হাওয়া তাঁহার জ্যোতির সাধারণ ধর্ম্মই সর্ব্বত্র প্রবেশ করা সকল পদার্থকে প্রকাশ করা। আমরা অহংবশে জোর

করিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া তাঁহার প্রকাশে বাধা দিয়া থাকি। এই যে একটু দয়া করিয়া দরজা-জানালা খুলিয়া দিলেই তাঁহার বায়ু তাঁহার জ্যোতি আমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাদের ঘরখানিকে পবিত্রীকৃত আলোকিত করিয়া বসে, এটা কম কৃপার কথা নহে। এই যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এইভাবে আমাদের সেবা করিতে ব্যস্ত, এই যে মা-বাপ ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী আমাদের আনন্দবিধানে এত যত্নশীল—ইহার ভিতরে সাধক ভক্ত ভগবৎকৃপা দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যান। এই কৃপারও একটা তাল আছে বিধান আছে, তাহাকেই ভক্ত কর্ম্মবাদরূপে গ্রহণ করেন কর্ম্মরহস্যরূপে প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব সাধকগণ সেবাকুঞ্জ-তত্ত্বের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসক নাপতিনী আদি বেশে শ্রীরাধার নিকট গমন মানভঞ্জন আদি অভিনয়ের মধ্য দিয়া ভগবৎকৃপা-তত্ত্বকে ফুটাইয়া বাহির করিয়া আস্বাদ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা না হইলে তাঁহার চলেনা—আমরা তাঁহার খেলার সহায় লীলার অবলম্বন, ইহা কি কম কৃপার কথা—জীবের পক্ষে কম স্পর্দ্ধার কথা! তাঁহার স্বভাবই এই রকমের, তিনি এসব লীলা করিতে ভাল বাসেন ; কর্ম্মতত্ত্ব (Law of karma) তাঁহার একাজের সহায়, এরহস্যকে নির্দ্দিষ্ট তালের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া বাহির করে। বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার লীলার সহায়, সংহারকর্ত্তা মঙ্গল-দাতা শিব স্বেচ্ছায় তাঁহার আনন্দধামে পাহারা দিতে ভাল

বাসেন ; কোনও অনধিকারী আসিয়া যাহাতে রসভঙ্গ না করিয়া বসে সেজন্য তিনি সদা জাগ্রত। আনন্দের সঙ্গে কৃপানুভূতির সঙ্গে বিধান-তত্ত্বের সম্বন্ধ সেখানেও বর্ত্তমান। অহংভাব থাকিতে কৃপাতত্ত্ব ঠিকভাবে বুঝিতে পারা যায় না—বুঝিতে পারাও সে অবস্থায় ঠিক নয়। এই খেলাটা যে তাঁহার প্রেমকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য—যাবতীয় অজ্ঞানতা বিরহভাব দুঃখ-কষ্ট জ্ঞানকে মিলনকে আনন্দানুভূতিকে মধুরতর ভাবে আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য।...অজামিল মৃত্যুকালে পুত্র নারায়ণের নাম স্মরণ করিয়া মুক্তির অধিকারী হইল, কৃপাবাদী বৈষ্ণব দার্শনিক পণ্ডিতগণ ইহার মধ্যেও তাহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির মধ্য দিয়া তাহার ক্রমমুক্তির রাস্তার গতিমাত্র নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—কৃপাতত্ত্ব দেখাইতে গিয়া পরমকৃপাবাদিগণও কর্ম্মবাদীকে অগ্রাহ্য করিতে বসেন নাই, সেখানেও ভগবৎবিধানে বাধা পড়ে নাই। পুরাণে দেখিতে পাই, কৃপাময় শ্রীভগবান জীবের কোনও একটা সৎগুণ অবলম্বনে তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লইতে ব্যস্ত। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার প্রিয়তম জীবকে তাঁহার কাছে ডাকিতেছেন—সে ডাকের বিরাম নাই। তিনি প্রেমিক জীবের সঙ্গে একটা প্রেমের সম্বন্ধ রাখিতে চান, তাই জোর করিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু